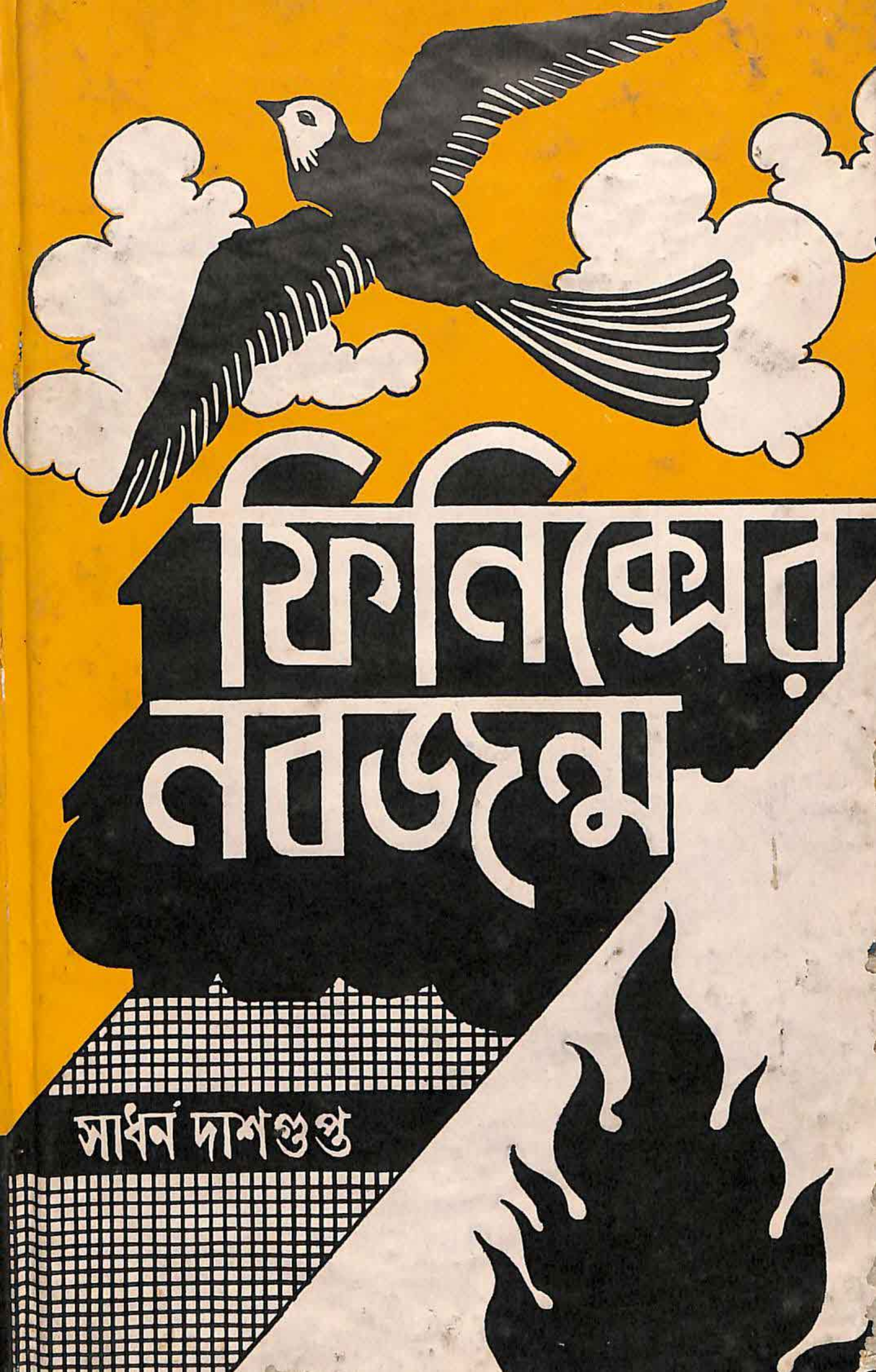

ফিনিক্সের
নবজন্ম
সাধন দাশগুপ্ত

ফিজিক্সের নবজন্ম

বিজ্ঞান-পুরাণ

সাধন দাশগুপ্তের

ঈস্টার্ন বুক এজেন্সি
৮সি টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

THE REBIRTH OF PHOENIX—A SHORT HISTORY OF SCIENCE UP TO RENAISSANCE

ফিনিক্সের নবজন্ম

বিজ্ঞানের ইতিহাস :—
ইতিহাস পূর্বকাল থেকে ১৬৫০ খৃষ্টাব্দ

লেখক : সাধন দাশগুপ্ত

প্রথম প্রকাশ ১লা আষাঢ় তেরোশো ১৯৯০-৯১
প্রচ্ছদ দিলীপ দাস
অন্যান্য ছবি সোমনাথ রায়চৌধুরী
মূল্য— পনের টাকা মাত্র

ঈস্টার্ন বুক এজেন্সী শ্রীমতী নীহারকণা বন্দ্যোপাধ্যায় মণ্ডলপাড়া-অবন্তীপুর, চব্বিশ পরগণা কর্তৃক প্রকাশিত এবং স্টার প্রিন্টিং প্রেসের পক্ষে শ্রীগোপাল চন্দ্র পাল একুশের এ, রাধানাথ বোস লেন, কলিকাতা-৭০০০০৬

গ্রীস উপকথায় ফিনিক্স পাখির গল্প আছে ; এই পাখি আকাশের অনেক উপরে ওড়ে ; প্রাচীন হলে, নতুন শরীর পেতে এই পাখি নিচে নেমে আসে ; নিজের জন্য চিতা সাজিয়ে আগুন জেলে সে আগুনে নিজেকে আত্মাহুতি দেয় ; আর তারপর সেই আগুন থেকে বেরিয়ে আসে আরেক নতুন পাখি—যে আবার দূর আকাশে পাড়ি দেয়।

বিজ্ঞান যেন সেই ফিনিক্স পাখি ;—গ্রীস সভ্যতার সমাপ্তি কালে সে হারিয়ে যায় ; আবার সহসা দেখা দেয় রেনাসাঁসের কালে। এই বিজ্ঞান দূর যাত্রার জন্য ডানা মেলে ; তবে তার ডানার জোর দেখা দেয় ১৬৪২ সালের পর—যে বছর গালিলিওর মৃত্যু আর নিউটনের জন্ম। রেনাসাঁসের কাল হলো বিজ্ঞানের ডানা মেলার কাল, আকাশের হাতছানি মেনে নেবার কাল ; অসীমে ওড়ার প্রচেষ্টার কাল ; ফিনিক্সের নবজন্মের কাল এই রেনাসাঁস। আর তারপর আরো একবার ফিনিক্স নতুন কলেবর নেয়—তবে সে ১৯০০সালে, নব বিজ্ঞানের সূচনায়। ফিনিক্সের প্রথম নবজন্মে বিজ্ঞান বাইরের আকাশ দেখে, বস্তুর গতি নিয়ে ভাবে, যন্ত্রের ভাবনায় মাতে। আর দ্বিতীয়বারে সে জানতে চায়, বস্তু-তেজ অথবা অণু-পরমাণুর রহস্য ; মহাকাশের ঘরোয়া খবর ; সৃষ্টির উল্লাস !

এই বইটিতে ফিনিক্সের প্রথম নবজন্মের পালার বর্ণনা ;—মানুষের বিজ্ঞান অভিযানের সূচনা থেকে গালিলিও'র কাল পর্যন্ত যাত্রাপথ। বিজ্ঞানের অভিযান মানে মানুষের অভিযান—যে মানুষ ইতিহাস সৃষ্টি করে, যে দৃঢ় পদক্ষেপে অনেক দূর সমাজকে, গোষ্ঠীকে এগিয়ে নিয়ে যায়—সেই মানুষের অভিযান ! কাজেই এই বইটিকে এই কালের বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ ইতিহাস বলা যায় না, এর পরিপূরক হিসেবে আরো একটি বই প্রকাশের অপেক্ষায়—'হাতিয়ার থেকে যন্ত্র'। আর তৃতীয় বইটি গ্রীকবিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত—'থালীসের গাধা'। তিনটি বই মিলিয়ে ফিনিক্সের নবজন্মের কাহিনী। এই বইটি সেই ত্রয়ীর প্রথম জন।

১৯৮২ সালের এপ্রিল মাসে পুরুলিয়ার জে. কে. কলেজের বিজ্ঞান সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল আদিকাল থেকে ১৬৫০ সাল পর্যন্ত বিজ্ঞানের ইতিহাস। একটি আশ্চর্য সুন্দর ও নিবিড় আনন্দ ভরা আলোচনা সভায় ভাষণ ও প্রশ্নোত্তরের সূত্রে যে বক্তব্য গাঁথা হয় এই বই কটি তারই ফলশ্রুতি। আলোচনায় অংশী হয়ে যে শিক্ষক-অধ্যাপক-ছাত্ররা আমাকে কৃতার্থ করেছিলেন, তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। তাঁরা আমাকে ধন্য করেছেন। তাঁদের নামের নামাবলী আমার স্মৃতির আভরণ, আমার রোমাঞ্চনার আবরণ! তবু

বিশেষ করে স্মরণ করি, শ্রীশক্তি বসু, শ্রীমৃগাঙ্ক মৌলী উপাধ্যায়, শ্রীরত্তন মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রণবকুমার দে, শ্রীহেরম্ব ভট্টাচার্য্য, শ্রীমনোজ চৌধুরী, শ্রীঅচ্যুৎ চক্রবর্ত্তী, শ্রীসত্যেন গুপ্ত, বাদল মিশ্র, স্থনীল চ্যাটার্জি প্রমুখকে! এছাড়া রয়েছেন রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ ও অন্যান্য স্কুল কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকেরা।

আলোচনার বিষয়বস্তু বিস্তারিত ভাবে কোন্ বইগুলিতে পাওয়া যাবে এ বিষয়ে অনেকে প্রশ্ন রেখেছেন। একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী দেয়া হলো। কোপার্নিকাস, কেপলের, গিলবার্ট ও গালিলিওর বই গুলির ইংরিজি অনুবাদ পাওয়া যায়। ইংরিজি বইগুলির যথাযথ নাম এই বইএ ব্যবহার করা হয়েছে। এই সব বই দেখার ও আংশিক ভাবে পড়ার স্থযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমার দুর্ভাগ্য স্তেভিনের গ্রন্থের অনুবাদটি পাইনি। এই আশ্চর্য বিজ্ঞানীর রচনা সেদিনের মত আজকেও লোকচক্ষুর অগোচরে থেকে গেল!·····টাইকো ব্রাহের সঙ্গে হ্যামলেটের তুলনায় ইঙ্গিত আছে মাক্স ব্রডের 'টাইকো ব্রাহের দায়মুক্তি' উপন্যাসে এবং ক্রাউথারের বিজ্ঞানের ইতিহাসে। এই আবিষ্কারটি একটি বিস্ময়!

বইটির ছবি আমার এক কিশোর বন্ধু সোমনাথ রায়চৌধুরী এঁকেছে—স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেবার অবসরে ছবি আঁকার আনন্দে মশগুল হয়ে আমাকেও সে মধুর বিস্ময়ে ভরিয়ে তুলেছে! আর বইটি প্রকাশ করেছে আমার স্নেহধন্য দুই তরুণ-দুই ভাই। তাদের উৎসাহে আমি নিজের রোগযন্ত্রণাকে কত সহজে ভুলতে শিখেছি!

বিজ্ঞানের ইতিহাস শেষ পর্যন্ত শেষ হয় বিজ্ঞানীর ইতিহাসে, মানুষের ইতিহাসে। যে মানুষ প্রশ্ন নিয়ে বেঁচে থাকে, খোঁজার আনন্দে মাতোয়ারা হয়। এই বিজ্ঞানীদের কথা শুনতে চেয়েছিল পুরুলিয়ার একটি কিশোর—যে তার শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা ভুলতে চেয়ে বিজ্ঞানের পথকে মেনে নিতে চেয়েছিল। খোঁজার যন্ত্রণা, প্রশ্নের দংশন নিয়ে সেই ছোটনের নবজন্ম হোক – ফিনিক্সের এই প্রার্থনা। আর প্রার্থনা, তার সমবয়সীরাও এই যন্ত্রণার অংশী হোক!

বিজ্ঞানের কৈশোরটিকে শিশু শিল্পী, তরুণ প্রকাশক, আর কিশোর জিজ্ঞাসুরা পরিচয় করাতে চেয়েছে—তবু পুরুলিয়ার কলেজের উৎসাহ ছাড়া তা সম্ভব ছিল না। এই বইটি তাই পুরুলিয়ার দায়মুক্তি।

—তবে তা আংশিক! অন্যদুটি বই ছাড়া দায়মুক্তি যে সম্পূর্ণ হয় না!

কলিকাতা

সাধন দাশগুপ্ত।

1. "New astrologer who wanted to prove that the earth is moving and revolving...such are the times we live in : he who wants to be clever must invent something all his own and what he makes up he naturally thinks is the best thing ever ! This fool wants to turn the whole astronomy upside down."—Martin Luther [নব অরুণোদয় : পৃষ্ঠা ৫০]

2. "Wise rulers should tame the unrestraint of men's minds."—Melanchthon [নব অরুণোদয় : পৃষ্ঠা ৪৯]

3. "To astronomers,Land-measures, Measurers of cloth, Gaugers, Stereometers in general, Money-counters, and to all Merchants,—Simon Stevin wisheth health."

—Simon Stevin [ভোরাই গান : পৃষ্ঠা ৫৩]

4. The experiment against Aristotle is this ; let us take two leaden balls, one ten times greater in weight than the other which allow to fall together from a height of thirty feet upon a board or something from which a sound is clearly given out and it shall appear that the lightest does not take ten times longer to fall than the heaviest but they fall so equally upon the board that both noise appear as a single sound. The same in fact also occurs with two bodies of equal size but in tenfold ratio of wight."

—Simon Stevin [ভোরাই গান : পৃষ্ঠা ৫৪]

5. "I give up myself up to a sacred frenzy. I scornfully defy mortals with the open avowal : I have plundered the golden vessels of the Egyptians to furnish a sacred tabernacle with them for my God,far from the borders of Egypt. If you forgive me, I shall be pleased. It you are angry with me, I shall bear it. Well, than, I cast the die and write a book for the present or for posterity. It is all the same to me. It may wait a hundred years for its reader, as God too has waited six thousand years for a spectator.

J. kepler [বাঁধন ছেঁড়ার প্রচেষ্টায় : পৃষ্ঠা ৬৮]

[বাইবেলের মতে খৃঃ পূঃ ৪৫০০ সালের কাছাকাছি পৃথিবীর জন্ম। কাজেই টাইকো—যিনি দর্শক, তাঁর জন্য স্থষ্টি কর্তার ৬০০০ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল।]

(৬) ৬৭ পৃষ্ঠার কেপলেরের উদ্ধৃতির উৎস মাক্স ব্রডের **Redemption of Tycho Brahe** উপন্যাস।

(৭) ৮০ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি রোমঁ। রোলাঁর জঁ। ক্রিস্তফ উপন্যাসের শেষ কটি স্তবকের ভাষান্তর।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Carleton S. Coon ... The story of Man
Herbert Butterfield & others ... A short history of Science
J. C. Crowther ... A short history of Science
F. S. Taylor ... An illustrated history of science
-do- ... Science : past and present
-do- ... The world of Science
2. Plato ... The four Socratic Dialogues
-do- ... The Republic
-do- ... Epionomis
Aristotle ... Politics
Apoleius ... The Metamorphoses
(OXFORD TRANSLATION SERIES)
3. Sir Harold Spencer Jones ... Copernicus
Seeger ... Galileo Galilie—His life and works
S. Drake ... Galileo at work : His Scientific Biography
A. C. Crombie ... Augustine to Galileo.
-do- ... Medieval and Early modern Science Vol I & II
4. Copernicus ... Collected works Vol 2 (On the Revolution of Heavenly spheres)
Galileo Galilie ... Dialogue Concerning The two chief world system ; Ptolemic & Copernicus
-Do- ... Two new Science.
W. Gilbert ... De Magnete ; On magnet and magnetic bodies.
J. Kepler ... Kepler's dream [Ed : John Lear]

এই লেখকের অন্যান্য বই

আলো আরও আলো
রোমাঞ্চকর রসায়ণ
এলবার্ট আইনস্টাইন
ভাষাগণিত
মির্জা গালিব
হাতিয়ার থেকে যন্ত্র (যন্ত্রস্থ)
থালীসের গাধা (যন্ত্রস্থ)

সূচী ঃ=

প্রথম পর্ব

ডানার ঝাপট

দ্বিতীয় পর্ব

আকাশের হাতছানি

ত্রুটি স্বীকার

যে কোনো বইয়ের মত এখানেও কিছু মুদ্রণ প্রমাদ আছে।—এখানে প্রমাদটি প্রমোদের মত মজার! ২৫ ও ৩৪ পৃষ্ঠার "সচ্ছল" ও "সচ্ছলতা" মর্যাদা নিয়ে 'স্বচ্ছল' ও স্বচ্ছলতা' হয়েছে। আর ৫৫ পৃষ্ঠার ব্লকটি সংশোধন করতে গিয়ে নতুন ভুল এসেছে যেখানে দেখা যায় ব্রাহে আটবছরে মঙ্গলগ্রহের পথ এঁকেছেন! —তারিখটা হবে ১৫৮৩—১৫৮৪,ব্লকে আছে ১৮৫৩—১৮৫৪! ভুল- ভুলই! তবু……

প্রথম পর্ব ঃ ডানার ঝাপট

অন্ধকার পেরিয়ে

কবে মানুষ এল—যে মানুষ আজ এই পৃথিবীর মালিক ?

এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানা নেই। পুরাতত্ত্ববিদরা ভাবেন এই অদ্বিতীয় দ্বিপদ স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব প্লাইসটোসিন (*Pleistocene*) যুগের শুরুতে—সে প্রায় দশলক্ষ বছর আগে। তারপর দীর্ঘদিন ধরে পৃথিবীর নানা অঞ্চলের জলবায়ু, তাপ-আলোকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার ফলে তার শরীরবৃত্তের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। ধীরে ধীরে বিবর্তন ধারায় মানুষ-প্রজাতি প্রকৃতির ঝাড়াই-বাছাইয়ের রীতিতে একটি সামগ্রিক রূপ পেল—যে রূপ দেখে আদিযুগে গল্পবুড়োরা শ্রোতাদের ডেকে বললে, স্বয়ং ঈশ্বর তার নিজের প্রতিকৃতিতে মানুষ তৈরি করলেন—তাই মানুষের অসীম ক্ষমতা, অনন্ত কাজের সম্ভাবনা ; সে পারে প্রকৃতিকে নিজের করে নিতে, পারে প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে।

গল্পের এই সহজ সরল কথাতে রূপকথার স্বাদ থাকছে। তবে একটি সত্য নিশ্চয় আছে—নিজেকে বিস্তৃত করতে মানুষ প্রকৃতির উপাদান এমন নির্বিচারে ব্যবহার করছে, তাতে আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে ; ক্যান্সার রোগের মত পৃথিবীর উপর মানুষ দ্রুতহারে ক্ষয় জুগিয়ে যাচ্ছে। এই ক্রমিক অপচয়কে যেমন বলা হচ্ছে মানুষের সংস্কৃতির অগ্রগতির মান, তেমনি বলা হচ্ছে বিজ্ঞানের অভিশাপ।

সংস্কৃতি আর বিজ্ঞান এ দুটি শব্দ নিয়ে পণ্ডিত-প্রাজ্ঞজনরা যত তর্ক-তকরারের কচকচানি করেছেন, শব্দার্থের এত সংজ্ঞা জানিয়েছেন যে সেটাই এক মহাভারত হতে পারে। নববিজ্ঞান,সাধারণভাবে, পুরুষানুক্রমে অভিজ্ঞতার ধারায় যে সব পন্থায় মানুষ জীবনধারণ করেছে তাদের সামগ্রিক রূপটিকে বলছে সংস্কৃতি, আর বিজ্ঞান বলতে বলছে এই সামগ্রিক রূপের পথে যাবার নানা বিকল্প পথের মধ্য থেকে সঠিক পথটিকে যুক্তি দিয়ে যুক্তি প্রয়োগের পথ ধরে নিরপেক্ষ উদাসীন ধারায় অন্বেষণের রূপায়ণ

খুঁজে নেয়া। বিজ্ঞান হলো সমগ্রকে খোঁজার ধারা, সমন্বয়ের হদিশটিকে চেনা ; যে নিয়ম এই সমগ্রতাকে বেঁধে রেখেছে,যার অনুরণন অণু পরমাণু থেকে মহাবিশ্বলোকের সর্বত্র সুর তোলে, সেই নিয়মকে জানতে চাওয়া। সেই নিয়ম সর্বতোভদ্র, সর্বানুভূ, সর্বপ্রসারী। সেই নিয়ম বিশ্বপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে বলে মানুষের অবক্ষয়ের প্রবৃত্তিকেও থামিয়ে দেবে। এই নিয়ম প্রকৃতির সঙ্গে মানব-প্রকৃতির একাত্ম হবার নিয়ম। বিজ্ঞানই সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে ; কারণ সংস্কৃতি হলো সমগ্রতা। আর কালচারের অর্থ তাই রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—কৃষ্টি নয়, সংস্কৃতি। বিজ্ঞানের চেষ্টা হলো সেই সমগ্রতার পথ খোঁজা—মেনে নেয়া নয়, খুঁজে নেয়া। প্রমাণের পথে সংশয় দ্বিধা কাটিয়ে নেয়া। এই পথে মানব সংস্কৃতি সর্বাত্মক রূপ পেতে পারে। এটি নব বিজ্ঞানের প্রত্যয়। মানুষের হদিশ জানতে গিয়ে প্রথমেই কতগুলো ভারি গুরু গম্ভীর কথা আওড়ানো হচ্ছে। তার কারণ হলো—আমাদের বাঙালী জাতের রীতি হলো ভুরিভোজনের আগে তেতো দিয়ে শুরু করা—তেতো খাবার পর, বিকৃত মুখে, আর যা কিছু পরিবেশন করা হোকনা কেন, অমৃত লাগে। এই সুযোগটা এখানেও নেয়া। তবে গোপাল ভাঁড় বলেছিলেন, পোড়া দিয়ে খেতে শুরু করতে—কারণ পোড়ামুখে সব ভাল। আমাদের মানুষের শুরুও ঐ পোড়ামুখ দিয়ে। আর পোড়াবার আগুন হাতে নিয়ে মানুষের জয়যাত্রা।

মানুষের ইতিহাসকে পুরাতত্ত্ববিদরা চারভাগে ভাগ করেছেন। আর দেখেছেন প্রতি পর্যায়ে মানুষ নামক জীবটি চিরকাল পরস্পর পরস্পারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এসেছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে মানুষ একেবারে তুলনারহিত—অনন্য। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষে দেখা গেল হোমো স্যাপিয়েন্স বা বুদ্ধিমান মানুষ নামের মানুষ-প্রজাতি তার সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপসারিত করে, আত্মসাৎ করে অহঙ্কারে দম্ভে নিজেকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করল। এই প্রতিষ্ঠা করার কারণ হলো, অন্য মানুষের হাতে নানা হাতিয়ার থাকলেও, আগুনকে নিয়ন্ত্রণ করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল হোমো স্যাপিয়েন্সের। আর তারপর আধুনিক কাল পর্যন্ত হোমো

স্যাপিয়েন্স নামের বুদ্ধিমান মানুষের দল পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে হানা-হানি করে, অন্য দলকে হঠিয়ে, সরিয়ে, মুছে ফেলে, পৃথিবীকে দখল করতে চলেছে। যে ট্রাডিশন আদিযুগে চলেছিল, বিংশশতাব্দীর শেষেও তার সমাপ্তি ঘটেনি। নিজেদের প্রজাতিকে ধ্বংস করার এই প্রবৃত্তি অন্য প্রাণীজগতে সর্বদা সর্বত্র দেখা দেয়না। এই প্রবৃত্তিকে, ধর্ম বা গুণকে আমরা বলতে পারি পাশবিক নয়,—মানবিক।

প্রায় আটলাখ বছর আগে থেকে পৃথিবীতে হিমবাহেরপর হিমবাহ নেমে এসেছে। মানুষ তখন প্রকৃতিতে দেখা দিয়েছে। সেই সময় ছিল মুখ্যত ইতিহাসের জৈব পর্যায়। শেষ হিমবাহের চিহ্ন পাওয়া যায় আজ থেকে দশবিশ হাজার বছর আগে। পৃথিবী তখন অন্য ধরনের ছিল। উত্তরে কনকনে শীত, ইংলণ্ডের মুখ সবে গ্লাসিয়ার সরে একটু একটু করে দেখা দিচ্ছে। আফ্রিকার উত্তর অঞ্চল ভিজে স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা। এইখানে কোন একসময়ে মানুষ কৃষিসভ্যতা গড়ে তুললো।

তার আগে মানুষ হাতিয়ার গড়েছে ; প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবে পাওয়া নানা উপকরণ থেকে কাজের জিনিসটি বেছে নিতে পেরেছে। জেনেছে দু'হাজারের বেশি নানা গাছ থেকে খাবার পাওয়া যায়, কোন বীজ বা ফল সংরক্ষণ করা যাবে, কাকে কখন পাওয়া যাবে ; আর জেনেছে কোন পাতায় ডালে, ত্বকে বা ধাতুতে রোগ সারাবার কি গুণ আছে। পাথর থেকে ফ্লিন্ট বেছে নিতে পারলো মানুষ ; জানলো ফলন্ত গাছের ডাল শক্ত। জানলো শিকার প্রাণীর কোন্ জায়গায় আঘাত করলে শিকার তাড়াতাড়ি মারা যায়। এই জানা হলো চোখ আর হাতের সমন্বয়ে জানা।

চোখ আর হাতের এই সমন্বয় বানর জাতিও করতে পেরেছিল। মানুষ তার বেশি কিছু করে। কি ঘটছে তা দেখে সে চোখ দিয়ে; সেই দেখাকে সে বুঝতে চেষ্টা করে, জানতে চায় যে দেখা চোখের মণিতে ধরা দেয় তার স্মৃতি, তার ছবি চোখের বাইরে, মনে বা বুদ্ধিতে কি সংবাদ জানাচ্ছে। সেই সংবাদে কি ধরা পড়ে নতুন তথ্য বা তত্ত্ব ? যেমন ফ্লিন্ট। —ভাঙা ফ্লিন্ট ভাঙা বোতলের মত ধারালো—এই দেখাটি মানুষ হাত

দিয়ে বোঝে। আর বোঝে ধারালো ফ্লিন্ট দিয়ে কাজের চৌহদ্দি বাড়ানো যায়। চৌহদ্দি বাড়াতে লাগে তার সামনের তুই প্রত্যঙ্গ—তার হাত। চোখ থেকে দেখাকে বিস্তৃত করে যে হাতে নিয়ে আসা—এটিই প্রথম বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের ধারায় মানুষ চারপাশের জীবজগৎ থেকে সরে দাঁড়ায়। বিজ্ঞানের পথ ধরেই মানুষের প্রগতি-অগ্রগতির বিবর্তন দেখা দেয়। চোখের দেখা গতি আনে, ক্রিয়া জাগায়, পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বার খুলে দেয়। মানুষ সেদিন সত্যিকারের মানুষ হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের মানুষ হয়ে দাঁড়াবার ইতিহাসের আগে থাকে বিজ্ঞান, এ হলো আধুনিক নৃতত্ত্ববিদদের মত।

এই মানুষ আগুন পেল। জানলো আগুনে পোড়া খাবার তাড়াতাড়ি খাওয়া যায়; রাত্রে আগুন আলো দেয়; শীতে তাপ। তাছাড়া আগুন নিরাপত্তা-বোধ জাগায়। আগুন অবসর আনে; গোষ্ঠীর বন্ধন জোরদার হয়; গালগল্প করা যায়;—কথা বলার শক্তি বাড়ে। ইঙ্গিতে, ভঙ্গিতে, আধোকথায় যে কাজ এতদিন সে চালিয়েছিল,—তাকে কথার ভেলায় ভাসিয়ে পাড়ি দেয়া যায়। আগুন মানুষকে অবসর দেয়; আগুনে কথার জোয়ার নামে।

নৃতত্ত্ববিদরা বলেন, প্রকৃতি মানুষকে পাঁচটি বিশেষত্ব দিয়েছে—আর এই বৈশিষ্ট্যের সুযোগে মানুষ পৃথিবীর প্রভুত্ব লাভের সুযোগ পায়। এরা হলো—তার খাড়া হয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গি, যা তার চলাচলে দ্রুততা আনে; —দীর্ঘপথ হেঁটে গেলেও পুরো দেহের ভার বহন করতে পারে তার তুই পা; তার দেহের অঙ্গসংস্থান—মেরুদণ্ড, শ্রোণীচক্র, ধড়, মাথা, উর্দ্ধ প্রত্যঙ্গ—সবগুলিই ভার বহনের পক্ষে দৃঢ় হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়টি হলো তার স্বচ্ছন্দ গতিসম্পন্ন তুটি বাহু আর হাত। কি বিস্ময়ের এই তুটি প্রত্যঙ্গ। বর্তমানে বিজ্ঞানের প্রযুক্তি-যুগে এ যুগের শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়াররা সকলে একযোগে দীর্ঘদিন চেষ্টা করেও এর চেয়ে বা এর কাছাকাছি সূক্ষ্ম ব্যবহারের উপযোগী নিখুঁত কোনো যন্ত্র আবিষ্কার করতে, উদ্ভাবন করতে পারবে না—একথা ঘোষণা করার জন্য হলফনামা দাখিল করার প্রয়োজন নেই।

তৃতীয় বিশেষত্ব হলো মানুষের তীব্র ফোকাস-যুক্ত চোখ।—দুটি চোখের অবস্থান এমন যে প্রতিবিম্ব ধরা যায় একটি ; আর তাতে জাগে ঘনত্বের বোধ। মানুষ বর্ণালী বিশ্লেষণ করতে পারে। এ ধরনের কাজ বানরের চোখও পারে। বানর যা পারে না, এবং মানুষ যা পারে, তা হলো চোখের দেখাকে চোখের বাইরে টেনে আনা। সেটি পারে তার চতুর্থ বৈশিষ্ট্যের ফলে—সে হলো তার মস্তিষ্ক। এই মস্তিষ্কে ঠাসা আছে যুক্তি। অথচ কত কুশ্রী দেখতে। প্রাচীনরা তাই ভাবতেন হৃৎপিণ্ডই হলো বুদ্ধি আর অনুভূতির কেন্দ্র—কারণ হার্ট দেখতে কত সুন্দর, কত লাল, কত রক্তাভ।...মানুষের মস্তিষ্ক গঠনের জন্য নয়, আকার বা আয়তনের জন্য তুলনাহীন। কোনো কোনো স্নায়ুতন্ত্রবিদ ভাবেন মানুষের আধুনিক সাংস্কৃতিক প্রয়োজনের পক্ষে তার যে বর্তমান মস্তিষ্ক—তা দরকারের চেয়ে অনেক বেশী। তাঁরা ভাবেন, মানুষের সামনের সম্মুখ প্রান্তের মস্তিষ্ক বাদ দিলেও আত্মজনতার কাজে উনিশ-বিশ ঘটবে না। তবু এই বিরাট মস্তিষ্কের ফলে তার অনুষঙ্গ-এলাকাও বিস্তৃত-প্রসারিত হলো। চোখের দেখাকে হাতের বাইরে টেনে আনে মস্তিষ্ক—হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে নিয়ে ঝুলিতে ভরে, অভিজ্ঞতার পুঁজি বাড়িয়ে মানুষ আবার সামনে তাকায়, হাত বাড়ায়। কারণ হাতের মুঠির বাইরে থাকে অনেক অজানা, চোখের দৃষ্টির সীমানার বাইরে থাকে অনেক অদেখা। অদেখা আর অজানাকে ঝুলিতে ভরে নিতে মস্তিষ্কই মানুষকে আগ্রহী করে। এই মস্তিষ্ক হলো পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমন্বয়ে অনুভূতি আর যুক্তির পথে গড়ে ওঠা এক কমপিউটার। এই ধরনের কমপিউটারের অধিকারী শুধু মানুষ।

শেষ বৈশিষ্ট্য হলো—কথা বলা। মস্তিষ্ক যত বড়ই হোক না কেন, আমরা যাকে চিন্তা করা বলি, কথা বলতে না জানলে সেই চিন্তা সমগ্রতা পেতে পারতো না। কথা বলতে, ভাব প্রকাশ করতে, মানুষ আরণ্যক জীবনকালে শিখেছে। তার সোজা হয়ে বসার অভ্যাস, তার চমৎকার দৃষ্টিশক্তি, তার মস্তিষ্ক আর বাগ্‌যন্ত্রের গঠন—এরাই হলো কথা বলার, ভাষা বানাবার উপকরণ। মানুষ যত সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা

বিনিময় করতে সমর্থ হয়, তত দেখা যায় ভাষার পরিবর্ধন, পরিমার্জন আর পরিবর্তন। কারণ ভাষা হলো মস্তিষ্কের অনুষঙ্গ-এলাকা।

এই পাঁচটি বিশেষত্বের অধিকারী মানুষ হিমবাহের যুগে, হাতিয়ার বানিয়ে জাগিয়ে তোলে পরিবহন ক্ষমতা, যোগাযোগের উন্নতি, বিভিন্ন পদার্থ ব্যবহারের ক্রমিক অগ্রগতি।

সাড়ে সাতলাখ বছর ধরে একটি মাত্র পরিবেশ ছিল মানুষের আবাস-ভূমি। তা হলো উত্তরের তুষার-সীমার দক্ষিণ প্রান্তিক অঞ্চল। শেষ হিমবাহ যুগে নৃতাত্ত্বিক মানুষের নানা বিবর্তনের বিকাশের ইতিহাস থেকে জানা যায় হোমো স্যাপিয়েন্স মানুষ অন্যান্য শ্রেণীর পূর্ণমস্তিষ্ক মানুষকে নিজের জন্য, নিজের সুবিধা বা মঙ্গলের জন্য, আত্মসাৎ করে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। প্লাইসটোসিন যুগের শুরু থেকে চতুর্থ হিমবাহের কালের সাতলাখ বছরের মধ্যে মানুষ পাথর-হাড়ের হাতিয়ার গড়েছে, খাদ্য পাক করতে শিখেছে, চামড়ার ব্যবহার শিখেছে, প্রাথমিক চিকিৎসার জ্ঞান জেনেছে। জেনেছে চকমকি পাথর, অরণি কাঠ আর গরম পোশাকের ব্যবহার। আর বানালো এক নতুন হাতিয়ার—কুড়োল—বা কুঠার—যাকে বলা হলো বিউরিন। পরশু হাতে নিয়ে মানুষ পরশুরাম হয়ে ত্রিভুবন পরিক্রমায় বেড়ায়। প্রকৃতি তাকে বাধা দিতে পারে না ; সমুদ্র তার গতি রুখতে পারে না ; কারণ সে শালতি নৌকো বানাতে পারে। শিকারী মানুষ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, বেরিং-সাগর পার হয়ে যায় দুই আমেরিকায়, ভূমধ্যসাগর পার হয়ে আফ্রিকায় ; প্রশান্ত-মহাসাগর পাড়ি দিয়ে পৌঁছোয় পলিনেশিয়া বা ওশেনিয়া অঞ্চলে। সর্বত্র মানুষ এল ; কারণ তার হাতিয়ার আছে। অন্য প্রাণীরা যা করেনি, মানুষ তাই করল ; সমস্ত প্রাণীতাত্ত্বিক অঞ্চল সে দখল করে। এই সময়ে সে তীরধনুক আবিষ্কার করেছে, আর শিকারের সঙ্গী হিসেবে পোষ মানিয়েছে কুকুরকে। আর তারপর নামে শেষ হিমবাহ—আর প্লাবন। যে প্লাবনের গল্প আছে বাইবেলের পাতায়, কোরানের ছত্রে, মনুর গাথায় এবং মেসোপটেমিয়ানদের পুরাণে। প্লাবনের শেষে হঠাৎ তাপ বেড়ে যায়। যেখানে জল ছিল, সেখানে হঠাৎ শুষ্কতা জাগে। উত্তর

আফ্রিকার যে অঞ্চলে মানুষ কৃষিকর্ম শুরু করেছিল, তারা সে জায়গা ছেড়ে ছড়িয়ে পড়ে। হাজির হয় নদীর ধারে। প্রথম সভ্যতা তাই নদীমাতৃক ;—মিশরে নীলনদের ধারে, মেসোপটেমিয়ার ইউফ্রেতিস-তাইগ্রিস নদীর অববাহিকায়, ভারতে সিন্ধুনদ অঞ্চলে আর চীনে হোয়াংহো-সিকিয়াং নদী অধ্যুষিত প্রদেশে।

প্রথম দিনের সূর্য

এই উপনিবেশের ফলাফল হলো পূর্ববর্তী দশহাজার বছর ধরে মানুষ যে কলাকৌশল শিখেছিল, শিখেছিল হাতিয়ার সৃষ্টি, কৃষিকাজ, পশু-পালন, খামারবাড়ি, পাথর আর কাঠের ব্যবহার—তার সবকিছু একেকটা অঞ্চলে হঠাৎ যেন আটকা পড়ে থাকে। নদীর পার তৃণশ্যামল ; আর সেখান থেকে দূরে পাথর-পাহাড় অথবা মরুভূমি। উপনিবেশ অঞ্চলকে প্রকৃতি সুরক্ষিত করে রেখেছে। উপনিবেশিক মানুষ তাদের নিজের নিজের সুরক্ষিত অঞ্চলে নিরাপত্তাকে টেনে নিয়ে অবাধ-নির্বাধ সুখে-শ্রমে জীবনযাপন শুরু করে। কৃষির উন্নতি ঘটে, ধাতুর ব্যবহার দেখা দেয় ; কথা বলার পর আসে লিপি আবিষ্কার। আর সামাজিক বন্ধনে শ্রম বিভাজন ঘটে ; গাঁওবুড়ো হয় রাজা,মোড়ল হয় রাজপ্রতিভূ ! আর তখনই ধরা দেয় অন্যের শ্রমের উপর আরেক দলের হক। সেই পথে দেখা দেয় সংখ্যাতত্ত্ব আর জ্যামিতি।

মিশর-মেসোপটেমিয়া-সিন্ধুসভ্যতা বা চীন—সর্বত্র একই রূপ। আদি নদীমাতৃক নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার শুরু প্রথম যে কোথায় হয়েছিল তা নিয়ে তর্ক আলোচনা চলতে পারে। কারণ সেই ইতিবৃত্ত কোন পুঁথিতে

লেখা নেই, নেই কোন লাইব্রেরীতে ধরা। পুরাতাত্ত্বিকরা মাটি খুঁড়ে গুহা খুঁজে তন্ন তন্ন করে যেসব হদিশ জোগাড় করেছেন, তা থেকে জানা যায় আদি সভ্যতার শুরু খৃষ্টপূর্ব ছ'হাজার বছর আগে নীলনদের অববাহিকায়। রাজা মেনেস (*Menes*) এর আমল থেকে মিশরের সমৃদ্ধি শুরু। খৃষ্টপূর্ব ৫০০০ থেকে খৃষ্টপূর্ব ২০০০ বছরের মধ্যে মিশরের পিরামিড তৈরি হলো। জল নিকাশের ব্যবস্থা হলো—আর সেই পথে ইঞ্জিনিয়ারিং এর শঙ্খধ্বনি তুললেন মিশরীয়রা। রাজার কর আদায়ের পদ্ধতি ধরে সংখ্যা এল, জমির মাপজোক করতে জ্যামিতি দেখা দেয়। গণিতের রীতিতে ধরা পড়ে যোগ বিয়োগ আর গুণ ভাগের প্রাথমিক ধারণা। বৃত্ত সম্পর্কে, ত্রিভুজ সম্পর্কে যে ধারণা তারও জন্ম মিশরে। বিখ্যাত পরিধি-ব্যাসের অনুপাতজ্ঞাপক π নামক ধ্রুবকের মান এরা পেলেন ৩'১৬০৫। তাদের বছর ছিল সৌর পদ্ধতি অনুযায়ী ৩৬৫ দিনের ; তারা দেখেছিল নির্দিষ্ট সময়ে বর্ষা নামে আর মিশরে দেখা দেয় প্লাবন। আজকের হিসেবে বলা যায় ১৯ শে জুলাই হলো বর্ষা নামার দিন আর পয়লা সেপ্টেম্বর হবে প্লাবন। মিশরের খনাদেবী এই বচনটি কৃষকদের জানিয়ে গেলেন। মিশরীয়রা আকাশ দেখেছিল—তার কারণ আকাশের তারার পুনঃপ্রকাশ থেকে তারা ঋতু চক্রের আভাস পেত। আকাশ, নক্ষত্র, নদী, বন্যা, মৌসুমী হাওয়া, জ্যামিতি, সংখ্যা,—এমনকি চিত্রলিপি পদ্ধতি তারা পেল ; আর যা পেল তার রোমাঞ্চনার জাবর কেটে বাকি জীবন চালিয়ে যাবে বলে এন্তার ক্রীতদাস নিয়ে এল। যে যত ধনী, তার তত দাস। দাসেরা কী কাজ করে কে তার হদিস রাখে? আর এই অসংখ্য দাসের আবির্ভাবে মিশর হতমান, হতশক্তি হয়ে উত্তর থেকে আসা হিকসসদের হাতে পরাজিত হয়। নিজেরা যুদ্ধ করতে পারতো না—আর দাসেরা যে যুদ্ধ করবে অথবা তাদের দিয়ে যে যুদ্ধ করানো যাবে—এ সম্ভাবনা ছিল না। অথচ মিশরীয়রা ব্রোঞ্জ যুগে পৌঁছে গিয়েছিল। সোনা আর তামা সেদেশে প্রায় অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যেত। তাছাড়া কিছু কিছু চুল্লিও গড়েছিল—ধাতু ঢালাই হতো। মিশরের প্রাচীন ইতিহাসের হদিস আমরা পাচ্ছি—কারণ নিজেদের চিত্রী-

ভাষায় সেকথা পাথরে খোদাই করে তারা রেখেছিল। এই সুযোগ অন্যত্র আমরা দেখিনা। মেসোপটেমিয়ায় পাথর ছিল না—তারা পোড়া মাটির কাজ শিখেছিল। যেমন পাত্র গড়তো, তেমনি মাটির ফলকে ইতিবৃত্ত লিখে যেত। লেখার হরফ মিশর থেকে ধার করে এনে পরিবর্তিত করে নিল—চিত্রের বদলে আনলো চিহ্ন। তাদের লেখা পারশিকদের হাতে গিয়ে অন্যরূপ পেল। সেখানে এল কীলক রীতি।

দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের সমস্যা থেকে মেসোপটেমিয়াতেও শুরু হলো বিজ্ঞান চর্চা। গণিতে, বিশেষ করে সংখ্যা শাস্ত্রে, তারা মিশরীয়দের থেকে এগিয়ে থাকল। আগে সংখ্যা ছিল দশমাত্রিক। তারপর হঠাৎ করে তারা সেটা ছয়ে নামায়। কেন যে—তার কারণ জানা নেই। এই ছয়ের স্মৃতি আছে বারো মাসে, ছয় ঋতুতে, ডিগ্রির হিসেবে। ওদের শুধু দুটো সংখ্যাবাচক চিহ্ন ছিল—একক আর দশক। কোথায় কি ভাবে তাকে বসানো হয়েছে তা থেকে জানা যেত এটি একক না দশক। অর্থাৎ আমাদের বর্তমান সংখ্যা লেখার অবস্থান ভিত্তিক যে রীতি, তার সূচনা এদের হাতে। আর সংখ্যা নিয়ে ভাবতে গিয়ে, সংখ্যার সর্বজনীন নিয়মের কথা তারা ভাবে; এলজেব্রার সূচনা দেখা দেয়। প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় ডিগ্রি বা বর্গের সমস্যার সমাধানের পথের ইঙ্গিত এদের কাছ থেকে পাওয়া গেল। এবং পাওয়া যায় জ্যামিতি। তবে জ্যামিতির ব্যবহার হলো শুধু ক্ষেত্রফল মাপতে। মিশরীয়দের মত এরা জ্যামিতি নিয়ে মাতামাতি করল না—বরং জ্যামিতি আর গণনা দুটোকে এক সঙ্গে মেশানোর পদ্ধতির চিন্তা তাদের মাথায় উঁকিঝুকি মারে। নানা সারণী তারা তৈরি করে; ঘনফল মাপে, এবং জানায় দুই এর বর্গমূল। এরিথমেটিকেল প্রগ্রেসনের নিয়মটিও এদের। আর সার্ডসের ধারণা করল বলে উল্টো পথে লগারিথমের ভাবনা নিয়ে স্বপ্ন দেখে।

মেসোপটেমিয়ানরা আকাশ দেখল, গ্রহণ নিয়ে ভাবলো। নানা তথ্য জোগাড় করে আবার কবে গ্রহণ আসতে পারে তার আবছা একটা ধারণা আনলো। তাদের আকাশে মিশরীয়দের মত জ্যামিতি এল না—এল সারণী। নক্ষত্রপুঞ্জের সারণী।

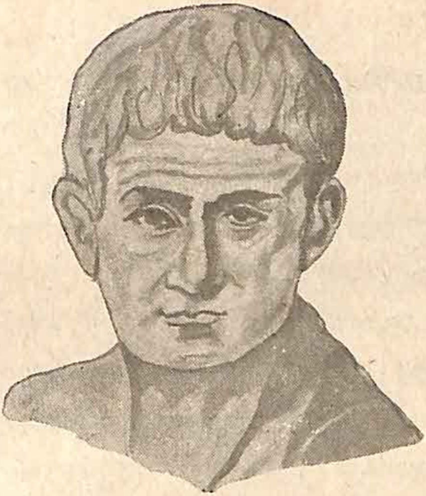
ভারতে অথবা চীনে একই সময়ে হয়তো বিজ্ঞান আর গণিতের ধারণা জেগেছিল, তবে সেই সভ্যতার চিহ্ন প্রায় লুপ্ত। ভারতে ছিল ধ্বনিমূলক ভাষা যার স্মৃতি চিহ্ন পাওয়া গেছে দুটি লিপি পদ্ধতিতে—যেমন ব্রাহ্মী ; —এটি কোনো সেমিটিক লিপিমালার পরিবর্তিত রূপ। আর দ্বিতীয়টি হলো খরষ্ঠী—যার প্রাচীন নিদর্শন হলো আরমাইক লিপি। তবে আদি ভারতীয় বর্ণমালা লুপ্ত হয়ে গেছে। শুধু জানা গেছে—সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের কৃষিকার্য ছিল উন্নত ধরনের; ব্যাপক জলসেচের ব্যবস্থা ছিল ; তারা কুম্ভকারের চাকা ব্যবহার করতো ; তারা ছিল দক্ষ ব্রোঞ্জ শিল্পী, মৃৎশিল্পী, জহুরী। ইট পাথরে গড়া তাদের স্থাপত্য ছিল অসাধারণ ; জল নিকাশের ব্যবস্থা পৃথিবীর মধ্যে উন্নততম ; আর নগর পরিকল্পনার যে ব্লুপ্রিন্ট আমরা দেখি, তা এ যুগেও বিস্ময় জাগায়। তবু এ অঞ্চলের মাটি এত আর্দ্র, এত ধ্বংসশীল যে, কোনো কিছু অবিকৃত পাওয়া যায় নি ; জানা যায় না তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাস, গণনা পদ্ধতি বা জ্যামিতি বা গণিত নিয়ে ভাবনা, তাদের জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা। তবে তাদের কারুশিল্পের দক্ষতা গ্রীকদের ভারত আক্রমণের সময় পর্যন্ত বজায় ছিল ;—ছিল অভিজ্ঞতার স্মৃতি ধরে। কারুশিল্প, দারুশিল্প, বস্ত্রবয়ন, ধাতুশিল্পে ভারতের যে অভাবনীয় উন্নতি মেগাস্থিনিস লিখে গেছেন—তার সূচনা সিন্ধু সভ্যতার যুগে—এ অনুমানের ভিত্তিটি কিন্তু দিনে দিনে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে।

অন্যদিকে চীনের সভ্যতা কালানুক্রমে মিশর-মেসোপটেমিয়া-সিন্ধু সভ্যতার পরে। এই তিন সভ্যতার কাল যদি খৃষ্টপূর্ব ৪০০০ সাল হয়, চীন সভ্যতার কাল তবে খৃষ্টপূর্ব ২০০০ বছর আগে কিছুতেই নয়। এই সভ্যতার বিস্ময়কর নিদর্শন হলো ব্রোঞ্জ ঢালাইয়ের কাজ ও রথ। হুইলবারো সম্ভবত চীনে প্রথম পাওয়া যায় ; পাওয়া যায় কাগজ, মুদ্রণ পদ্ধতি, বারুদ। লিপিও ছিল ;—তবে সে চিত্রীবর্ণমালা, কয়েক হাজার তার অক্ষর। প্রাচীন পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তবু চীন যে সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল, তাতে আশ্চর্য হতে হয়। পরিবহন যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল প্রসংশা করার মত। চওড়া পাথর বাঁধানো রাজপথের কল্পনা রোমান-

দের আগে চীনেরাই প্রথম করে। জলসেচের জন্য খালের ব্যবস্থা ছিল; —তবে মেসোপটেমিয়ার তাইগ্রিস ইউফ্রেতিস নদীর তুলনায় এই সেচ ব্যবস্থা অনেক সরল। চীনের সভ্যতার বিকাশ দেরীতে। আবার বিচ্ছিন্ন থাকার জন্য এই সভ্যতা অনেকদিন স্থায়ী ছিল। তারা খৃষ্টপূর্ব ২০০ সালে সার্ভেয়িং বা জরিপের অদ্ভুত পারদর্শিতা এনেছিল; স্কোয়ার ও কিউব রূট কষতে জানতো ; পিরামিডের অথবা অন্যান্য আকারের ভল্যুম মাপার পদ্ধতি জেনেছিল। আর জানতো সমকোণী ত্রিভুজের বড় বাহুর উপর আঁকা বর্গক্ষেত্রটি অন্য দুটি বাহুর উপর আঁকা বর্গক্ষেত্রের যোগফলের সমান। অর্থাৎ পিথাগোরাসের উপপাদ্যটি চীনের জানা ছিল। তবে চিন্তাটি চীনে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের আগে কখনই ধরা দেয় নি। পিথাগোরাস তাঁর উপপাদ্য প্রকাশ করেন খৃষ্টপূর্ব ৫০০ সালে। অঙ্কে চীনের আরেকটি অবদান হলো যাকে বলা হয় *False position*—সঠিক উত্তরের কম-বেশী ভাবনার পথে শুদ্ধ উত্তরে পৌঁছুনো। আরবীরা একে চৈনিক পদ্ধতি বলেছেন। পাই-এর মানটিও অতি শুদ্ধ ভাবে চীনরা জেনে ছিল। ১৩৬১ খৃষ্টপূর্বাব্দে একটি চন্দ্রগ্রহণ ও ১২১৬ খৃষ্টপূর্বাব্দের একটি সূর্য গ্রহণের ইতিবৃত্ত চীনের পুঁথিতে পাওয়া যায় ; আর খৃষ্টপূর্ব ১০০০ সালে একটি নতুন তারা বা নোভার কথা জানা যায় চীনের পুঁথিতে—ক্র্যাব নেবুলাতে এই তারার জন্ম মৃত্যু ঘটে। চীনেরা অনেক কিছু পেল, করল ; তবু বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা সেখানে ধরা পড়ল না। অশিক্ষিত পটুত্ব আর শৈল্পিক দক্ষতার নিয়ম জানার চেষ্টা তারা করেনি। চীনে অভিজ্ঞতার পথে কৃষ্টির আবির্ভাবে নানা জ্ঞানে পুঁথি ভরে ওঠে—তাদের ঝাড়াই বাছাই, সাজাই গোছাই হলো না। কোন্‌টা রাখা হবে, কোন্‌টা ফেলে দেয়ার তা নিয়ে হলোনা চিন্তা ভাবনা। এলো না সংস্কৃতি আর তার বাহন বিজ্ঞান।

এই চিন্তার রেশ দেখা দেয় গ্রীসে ৬০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে।

আদিম গ্রীকরা ছিল বর্বর-যাযাবর। কোনো একসময় দক্ষিণ রাশিয়ার কাস্পিয়ান সাগরের ধার থেকে চলে এসে এশিয়া মাইনর অঞ্চলে তারা উপনিবেশ করে—ঠিক মেসোপটেমিয়া আর মিশর যাবার স্থলপথের রাস্তায়। ব্যাবিলোনিয়ানরা এদের দেশকে বলত আয়োনিয়া—মানে যাযাবরদের দেশ। প্রাচীন প্রস্তর যুগ থেকে সবেমাত্র কৃষিভিত্তিক সভ্যতার যুগে গ্রীকরা তখন দেখা দিয়েছে। তারা, যাযাবর বলেই, হয়তো, থিবেস, ব্যাবিলোন বা ইজিপ্টে ঘুরতে ফিরতে বাণিজ্য করতে গেল। যা দেখল তাতে চমৎকৃত হলো ; তবে রোমাঞ্চিত নয়। নিজেদের দেশের চৌহদ্দি তারা ততদিনে বাড়িয়ে তুলেছে ; আয়োনিয়া ছাড়া, মূল গ্রীস,—যা আজকের গ্রীস—আর সিসিলি এই পুরো ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চলে জলপাই আর কমলা লেবুর ক্ষেত্রে গ্রীকরা গ্রাম গড়ল। নগরের পত্তনও করল। তবে ব্যাবিলোন বা মিশরের মত বিরাট বিশাল কিছু করার চেষ্টা করল না। বিদেশে যা দেখল, তা নিয়ে তারা ভাবতে বসে। গ্রীকরা সবে সভ্যতার পথে পা বাড়িয়েছে—তারা যেন শিশু। এই শিশুর কৌতূহল আর প্রশ্ন নিয়ে তারা মিশর-ব্যবিলোনকে দেখে ; আরো পূবে পারস্যে বা ভারতে কি ঘটে তার গল্প শোনে। এবং প্রশ্ন করে, কেন এমন হলো ? মিশরে ঠিক দিনে কেন বন্যা নামে, কেন ঋতুর পরিবর্তন ঘটে, জ্যামিতিক আকৃতির মানেটা কি, সংখ্যা দিয়ে কেন আর কিছু করা যাবে না, পিরামিডে রাখা মমি-করা রাজা কি করে ফিরে আসবে ? যে মারা যায়, সে যদি ফিরে আসে তবে মরা আর জীব-নের মধ্যে থাকে কি ?···অসংখ্য শিশুর মত প্রশ্ন তুলে গ্রীকরা ইজিপ্ট-মেসোপটেমিয়ার কাজ-কারবার বুঝতে চায়। তাদের কলাকৌশল নকল করে। অমর হবার চিন্তা না করে তারা ভাবে যতটুকু জীবন পাওয়া যায় তাকে কি সুন্দর করে নেয়া যায় ? ইকলাট বা সুন্দরের সন্ধানে গ্রীকরা প্রশ্নের উত্তর খোঁজেন। আর মেসোপটেমিয়ার



আরিস্তোতল



ইউক্লিড



আর্কিমীদিস



পিথাগোরাস

বর্ণমালায় স্বর চিহ্ন এনে লিপিকে সর্বজনীন করে সুন্দরের জয়গান গাইলেন।

সেই উত্তর খোঁজার পথিকৃত হলো থালীস—একজন বণিক,বাড়ি আয়োনিয়ার মিলেটাসে। ব্যাবিলোন-মিশর ঘুরে স্পঞ্জের মতো ওদের ধ্যানধারণা মাথার মধ্যে নিয়ে এলেন তিনি। আর সুযোগ মত প্রয়োগ করে লীডিয়ান আর মীডিয়ানদের এক যুদ্ধ থামালেন। বললেন, ওদের বোকামো দেখে সূর্য লজ্জায় মুখ ঢাকবে। সত্যি সূর্য মুখ ঢাকে—সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়। এই গ্রহণের হিসেব আজকের দিনের জ্যোতির্বিদরা করে জেনেছেন—সে হয়েছিল হয় খৃষ্টপূর্বাব্দ ৬০৯ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর, নয় খৃষ্টপূর্বাব্দ ৫৮৫ সালের ২৮শে মে। এই গ্রহণের ভবিষ্যদ্বুক্তি থালীস করলেন মেসোপটেমিয়ান সারণী ধরে। আর এইপথে জানা গেল থালীস খৃষ্টপূর্বাব্দ ৬০০ সালের লোক। থালীস জ্যামিতিক নিয়মের প্রমাণের সূচনা করলেন। যাকে বলা হয় লজিকের আরোহী-অবরোহী পদ্ধতি—তার সূচনা এঁর হাতে। নিজের লাঠির ছায়ার অনুপাতে পিরামিডের ছায়া মেপে পিরামিডের উচ্চতা মাপলেন। আর সবার উপর জানতে চাইলেন, সব কিছুর মূল কি ? কোথা থেকে শুরু ? থালীস প্রশ্ন তুললেন না—কে শুরু করেছে ? তার প্রশ্ন, কোথায় শুরু হলো ? মহাপ্লাবনের গল্প সব পুরাণে লেখা ; তার পথ ধরে সৃষ্টিতত্ত্ব সকলেই লিখেছে। মেসোপটেমিয়ানদের সৃষ্টিতত্ত্বের কিছু ইঙ্গিত বাইবেলে জেনেসিস অধ্যায়ে আছে। শিশু গ্রীকজাতির কৌতূহলী থালীস সেসব গল্প বিদেশে শুনে এসেছে। সব শুনে তার ধারণা হলো সবার আদি হলো জল। পৃথিবী বা ক্ষিতির উৎপত্তি জল থেকে। আগুনের মত যে সূর্য-চাঁদ পৃথিবীকে প্রহরায় ঘিরে রেখেছে তারাও জলের বাষ্পে তৈরি। জল হলো মূল। আর জ্যামিতির মূলে আছে যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ।

থালীসের কাল থেকে প্রশ্নোপনিষদের শুরু। আর আয়োনিয়া তখনো গ্রীক জ্ঞানের কেন্দ্র। থালীসের পরে এলেন আনেক্সিমান্দের, আনেক্সিমীনিস। মূল পদার্থ নিয়ে তাঁরা আরো ভাবেন। তারা ভাবেন মূল পদার্থেরও পরিবর্তন হতে পারে। জীবের সৃষ্টি জলে ; সূর্যের তাপে

জীবনের সূচনা জলে ধরা দেয়। জল ছেড়ে প্রাণী উঠে আসে ডাঙায়, আর মাছই হলো মানুষের আদি পুরুষ। অর্থাৎ প্রাণিজগতের বিবর্তন ধারার কল্পনা নিয়ে গ্রীকরা একটা খেলা শুরু করে।

এদের পর আসেন পিথাগোরাস। মিলেটাসের কাছে সামোসে জন্ম। থালীস-আনেক্সিমান্দেরের শিষ্য। বহুদিন পরিব্রাজক হয়ে ঘুরে এলেন ইজিপ্ট মেসোপটেমিয়ায়। আর দুই জাতের কাছ থেকে জানলেন জ্যামিতি, জানলেন সংখ্যাতত্ত্ব। রাজপুরুষের সঙ্গে বিবাদের ফলে আয়োনিয়া ছেড়ে পাড়ি দেন সিসিলিতে। সেখানে স্থিতু হয়ে বসে হঠাৎ তিনি বিস্ফোরকের মত ফেটে পড়েন। মেসোপটেমিয়ার সংখ্যা তাঁর কাছে মন্ত্রের মত ধরা দেয়। সে যুগে বার্টার পদ্ধতির পরিবর্তে টাকাপয়সার লেনদেন শুরু হয়েছে। সংখ্যা নিয়ে বণিকরা চিন্তাভাবনা করেন। আর এই বাণিজ্যিক প্রয়োজন-ভিত্তিক চিন্তা থেকে সরে গিয়ে পিথাগোরাস আর তাঁর সহগামীরা বিমূর্ত গণিতের সাধনা করেন। তাঁদের চিন্তার কোনো কোনোটা ব্যবহারিক দিক দিয়ে যুৎসই বলে বণিকরা বাহবা দেয়, রাজপুরুষের পৃষ্ঠপোষকতা জোটে—নিজের দলের লোকেরা রাজপ্রতিভূ হতে পারে। স্বচ্ছল অবস্থা। অতএব পিথাগোরানরা সংখ্যাজ্যামিতি নিয়ে নিরন্তর মেতে থাকে। এঁদের হাতে থালীসের প্রারম্ভিক জ্যামিতির ভিত্তির উপর অট্টালিকা শুরু হয়। জ্যামিতির প্রয়োগকে বাদ দিয়ে এরা জ্যামিতির নিয়ম ভাবেন। ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম দুটি বই এদের সৃষ্টি। তাছাড়া ছিল বিখ্যাত পিথাগোরাস থিয়োরেম—যা প্রকাশ হলো ৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে। সংখ্যা নিয়ে পিথাগোরানরা অনেক ভাবলেন। আর সেই ভাবনার শেষে তাঁরা ইররেশনাল নাম্বারকে পেলেন। দুই এর বর্গমূলকে খাঁটি কোন সংখ্যার ভিত্তিতে জানানো যায় না—যে ভগ্নাংশ দেখা দেয় সেটাও কেমন যেন বিদঘুটে। তাছাড়া বর্গের মূলে যে উত্তর পাওয়া যায়,জ্যামিতিক রীতিতে তার দুটো রূপ থাকতে পারে—যাকে আমরা বর্তমানে বলি প্লাস-মাইনাস। যেমন চারের বর্গমূল হলো $\pm$২। এই ইররেশনাল নাম্বারটি পিথাগোরানদের যুক্তির ভিত নাড়িয়ে দেয়। সুর থেকে গ্রহ-নক্ষত্রের পথে তাঁরা সংখ্যা

দেখেছিল ; তাঁরা ভাবতো এ জগৎ সংখ্যায় গড়া ; যে সংখ্যা মূলে রেশনাল। অথচ অমূলদ সংখ্যা মানে অমূলদ জগৎ থাকতে পারে। অর্থাৎ যে জগৎ দেখা যায়, বোঝা যায়, তার বিপরীত এক জগৎ থাকে যার মূলে থাকে না চেনা জানা রাশি ; থাকে বিপরীত চিহ্ন। এককথায় বর্তমান বিজ্ঞানের বিপরীত বস্তুর বিশ্বের কল্পনাটি পিথাগোরানরা তাঁদের ইররেশনাল নাম্বারে দেখলেন এবং যথারীতি ভয় পেলেন। অসম্ভব-অবিশ্বাস্য-ভয়ানককে কেমন করে মানা যাবে ? তাই ইররেশনাল নাম্বারকে তাঁরা লুকিয়ে রাখলেন।

এদিকে সুরের প্রবাহে সংখ্যা দেখে তাঁরা তরঙ্গগতির দ্বারের কড়ায় টুকটুক আওয়াজ তুললেন। সেখানে গণিতের প্রয়োগ করলেন। গণিতের এই বিস্তৃতি অন্য গ্রীকদের বিস্মিত করে, চমৎকৃত করে। এথেন্সে, শহর থেকে দূরে, এক জলপাই বাগানে প্লাতো তাঁর স্কুল, আকাদেমি, প্রতিষ্ঠা করলেন। সেখানে তোড়নে লিখে রাখলেন—গণিত অনভিজ্ঞদের প্রবেশ নিষেধ। এই আকাদেমিতে পিথাগোরাসের দু'শবছর পরে গণিত নিয়ে, জ্যামিতি নিয়ে, পূর্ণ আলোচনার ঢেউ ওঠে। এতদিন আধখ্যাঁচরা ভাবে এখানে ওখানে যে খাবল দেয়া হচ্ছিল, তাকে এড়িয়ে ক্রমপারম্পর্য বজায় রাখার সূচনা দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে চলে প্রাকৃতিক ঘটনা নিয়ে চিন্তা ভাবনা—মূল নিয়ে আলোচনা। একদল ভাবেন মূল হলো অবিকৃত, চির প্রবহমান—যেন মধু, আঠা, ভিসকাস লিকুইড। অন্যেরা ভাবেন, মূলকে ছোট থেকে ছোট করে এটমে আনা যাবে—এটম হলো মূলের একক, ইউনিট, যেখানে তার গুণধর্ম বজায় থাকবে। এটম নিয়ে সব কিছু গড়ে ওঠে। এটম যেন বাড়ির দেয়ালের ইঁট। পিথাগোরানরা ভাবতেন সংখ্যাই হলো এটম—আর দেমোক্রীতাস ভাবলেন বস্তুর শেষ এটমে। দেয়ালের ইঁটের গাঁথনিতে যেমন ফাঁক থাকে, এটমে গড়া বস্তুতেও ফাঁক থাকবে —সে ফাঁক হলো স্পেস ; সে শূন্য। তবু সেই শূন্য নির্গুণ নয়, তারও ধর্ম আছে, সেই ধর্ম শূন্যের।—এই স্পেস নিয়ে, তার ধর্ম নিয়ে গ্রীকরা এর পরে যা ভাবলো তাতে বিজ্ঞান নেই, থাকলো ভাববাদী দর্শন। তবু জ্যামিতি, সংখ্যা, এটম আর স্পেস এবং বস্তুর বিবর্তন বা পরিবর্তনের

সম্ভাবনার দ্বারে গ্রীকরা মানুষকে এগিয়ে দিল। সেই অগ্রগতির শেষ বিন্দুতে রইলেন ইউক্লিড—যিনি দশ অধ্যায়ের জ্যামিতি সংকলন করলেন।

পিথাগোরানরা তারের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সুরের মিল পেলেন—সেখান থেকে পেলেন সংখ্যা—যে সংখ্যা শব্দে-সুরে-শিল্পে হানা দিতে পারে। অতএব, তাঁরা ভাবে মহাবিশ্বের অতলে, তার ভিতে আছে সংখ্যা। এই চিন্তা যেন এক রোমাঞ্চকর উন্মাদনা জাগিয়ে দেয়। আরো পরে পিথাগোরানরা সূর্য থেকে গ্রহদের দূরত্বের অনুপাতে দেখলেন যেন সেখানেও বিভিন্ন সুরের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা তারের দৈর্ঘ্যের অনুপাত ধরা পড়ে। যা সুরে ছোঁয়া দেয়, তা দেখা দেয় গ্রহলোকে! এ যে কী বিস্ময়, কী আনন্দ! প্লাতো বললেন, এই যে স্বর্গীয় সুর—তা শুধু ঈশ্বরই শোনেন, মানুষের কানে তা বাজে না।···ত্ব'হাজার বছর পর কেপলের এই সুরের একটি স্বরলিপি লিখলেন।

তবে গ্রীকরা একটি নিয়ে ভাবলেন না—সে হলো মেসোপটেমিয়ার সংখ্যার অবস্থান নিয়ে ভাবনা—একই সংখ্যা অবস্থানের পরিবেশে একক দশক বোঝাতে পারে—যেমন এক আর এগার।—এই ভাবনাটি গ্রীকদের চোখ এড়িয়ে গেল। অনেক পরে, দেড়হাজার বছর পর ভারতে এই ভাবনা এল। আরবদের হাত ঘুরে সেই সংখ্যারাশি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে,—সেদিন কিন্তু গ্রীক অন্ধকারে ভরা।

গ্রীকরা মিশরের জ্যামিতি নিয়ে বেশী ভেবেছিল। তারা জ্যামিতিকে দর্শনধারী না করে গুণবিচারী করে তোলে। অন্যদিকে মেসোপটেমিয়ার গণনা পদ্ধতি আর জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে তারা ভাবলো। গ্রীকদের দোষ হলো তারা পরীক্ষা নিরীক্ষায় বসতো না। অন্যের জানা তথ্য নিয়ে তারা হইচই করে, তর্ক করে,—যাকে প্লাতো বলেছেন সিমপোসিয়াম—তার মাধ্যমে তত্ত্ব খাড়া করতেন। তবু মেসোপটেমিয়া আর মিশরের চিন্তাকে এক সূত্রে গ্রীকরা বাঁধলো—বাঁধলেন আর্কিমীদিস। জ্যামিতির সলিড জিওমেট্রি শাখার সৃষ্টি তার হাতে, গণিতে এলজেব্রার রীতিও তিনি দিলেন। আর দিলেন হাতিয়ার-যন্ত্রের নিয়ম।

আদিকাল থেকে মানুষ ভেবে, না ভেবে—সহসা অথবা নকল করে যা করে এসেছে জেনেছে, যা তার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে ভরা,তারা কি, তারা কেন এমন ; কোথায় লুকিয়ে থাকে সর্বজনীন নিয়ম ? সেই নিয়ম কি ? অথবা কোন্ পদ্ধতি, কোন্ প্রণালী কোন্ ভাষা জানাবে সেই নিয়মকে ? সেই চিন্তার সূত্রপাত আর্কিমীদিসের হাতে। নৌকো জলে ভাসে, কাঠ ভাসে, মানুষও ভাসে, তবে ভাসে সাঁতারের পথে হাত পা ছুঁড়ে—কেন ভাসে ? আর্কিমীদিস জানালেন জলে ভাসার নিয়ম। নানা আকার—তাদের ভেতরে অনেক রাখার জায়গা ; তবু মানুষের মাথা গোল ; কেন গোল ? কারণ স্ফিয়ারের ভেতরে জায়গা বেশী, উপকরণ এখানে কম লাগে, অথচ তা শক্ত। লিভারের নিয়ম, পুলির নিয়ম, এমনকি ক্যালকুলাসের আদিম রীতি সব দিলেন আর্কিমীদিস। তাঁর লেখা থেকে জানা গেল তাঁর পূর্বসূরী আরিস্তারকাস জানিয়েছিলেন সূর্য কেন্দ্রিক গ্রহলোকের কথা—যা সেকালীন গ্রীক ধারণার পরিপন্থী ; গ্রীকরা জানতো এই মহাবিশ্বের সব গ্রহনক্ষত্র পৃথিবী কেন্দ্র করে ঘোরে। পৃথিবী হলো কেন্দ্রবিন্দু আর তাই সবকিছুর মালিক হবার অধিকারী মানুষ।

আর্কিমীদিসের পরে জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে গ্রীকরা কিছুটা ভাবনাচিন্তা করে। হিপ্পারকাস ১৬০ BC নাগাদ সৌর জগতের একটি গাণিতিক ছক দেন যার পূর্ণ রূপ পাওয়া গেল ১৫০ AD তে টলেমির হাতে।

আর এই সময়ে প্রাণবিদ্যা নিয়ে গ্রীকরা চর্চা করে। জলে জীবের জন্ম ; জীবের বিবর্তন আছে;—এই দুটি চিন্তাকে বিজ্ঞানে রূপ দেন আরিস্তোত্‌ল্ আর তাঁর ছাত্র থিওফ্রাসতুস। থিও বোটানির শ্রেণী বিভাগের শুরু করলেন সেই চারশ খৃষ্টপূর্বাব্দে। আর গুরু আরিস্তোত্‌ল্‌কে গবেষণায় সাহায্য করতে আলেকজান্দার নানা দেশ থেকে পাঠালেন ডালপাতা, প্রাণী, কীট-পতঙ্গ।

বিমূর্ত বিজ্ঞানের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীকরা যন্ত্র নিয়ে ভাবনা করে। আর্কিমীদিস যন্ত্র গড়লেন—মেকানিক্যাল লিফট, স্ক্রু পাম্প, হেলিকেল স্ক্রু অথবা জটিল লিভার আর পুলি পদ্ধতি। তবে গ্রীক যুগের শ্রেষ্ঠ

যন্ত্রবিদ আলেকজান্দ্রিয়ার হিরো। স্টিম টারবাইনের চিন্তা থেকে স্বয়ংক্রিয় শ্লট মেসিনের ভাবনা ছিল তাঁর।

গ্রীকরা বিজ্ঞানের নানা দুয়ারে কড়া নাড়ায়—এমনকি কেমিস্ট্রি বা এলকেমির সূচনাও তাদের হাতে। ফ্লুয়িড আর এটমতত্ব থেকে ধারণা জাগে বিছিন্নতা-অবিছিন্নতার বোধ, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের চিন্তা থেকে ক্যালকুলাস। কোয়ান্টাম থিয়োরি, রিলেটিভিটি তত্ত্বের বীজ গ্রীক চিন্তাতে ছিল।

বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি বা প্রযুক্তিবিদ্যা, সাহিত্য-নাটক-শিল্পকথা সব নিয়ে গ্রীকরা ভাবনা শুরু করে। ছোট জাত, ছোট জায়গা, লোকবল জনবল কম। তারা নতুন সভ্যতার অগ্রগতিতে একটা ফোর্স জুগিয়ে দেয়। অথচ সেই হোমো স্যাপিয়েন্সদের মত এরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে খেয়োখেয়ি করে গেল। কে যে নেতা হবে তা নিয়ে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে বিবাদ করল। থালীসের দুশো বছর পর এথেন্স হলো জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রবিন্দু—এখানে ছিল প্লাতো আর আরিস্তোত্‌ল্। আর আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর আলেকজান্দ্রিয়া হয়ে দাঁড়ায় শিক্ষাকেন্দ্র। প্লাতো তাঁর আকাদেমিতে পড়াতেন জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সঙ্গীত, সাহিত্য, ইতিহাস, আইন আর নীতিশাস্ত্র। সঙ্গীতের দেবী মিউজের পুজো আর উৎসব হতো বলে এ ধরনের আকাদেমিকে বলা হতো মিউজিয়াম—মানে সঙ্গীতের দেবীর পীঠস্থান। প্লাতোর আকাদেমিতে স্বয়ং প্লাতো সব বিষয় পড়াতেন, তাঁকে সাধারণভাবে অন্য শিক্ষকরা সাহায্য করতেন। আরিস্তোত্‌ল্ নিজেও এক স্কুল খুললেন, নাম লিসিয়াম। সেখানে পাঠ্যসূচীতে মুখ্যত ছিল বিজ্ঞান; যেমন প্লাতোর স্কুলে ছিল গণিত। ৩২৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে আলেকজান্দ্রিয়াতে টলেমি একটি বিদ্যালয় আর গ্রন্থাগার খুললেন—নাম মিউজিয়াম। আরিস্তোত্‌লের লিসিয়ামকে এখানে তুলে আনা হলো।

অন্যদিকে আর্থনীতিক অবস্থার উন্নতির কুফল আসতে থাকে। বিজ্ঞান ছেড়ে রহস্য রোমাঞ্চনার দিকে দৃষ্টি যায়। ভবিষ্যতে কি হবে, কি করে অন্যকে দাবিয়ে নিজেকে বড় করে তোলা যায়—এসব নিয়ে ধনী-নির্ধন-

দের চিন্তার ফলে জ্যোতিষের আবির্ভাব ঘটে। দাসপ্রথা দেখা যায়। আর ঘরোয়া বিবাদ ক্রমশ ভয়ঙ্কর থেকে ভয়ঙ্করতম রূপ নেয়। এই সময়ে ১৬৮ AD তে রোমানরা গ্রীস দখল করে।

গ্রীকরা এক হতে পারেনি। দলাদলি, নেতৃত্বের সমস্যা গ্রীসকে জর্জরিত করেছিল। অন্যদিকে বাণিজ্য ব্যবসায়ে উন্নতির ফলে ৪০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে গ্রীসে নৈতিক অবক্ষয়ের সূচনা জাগে। দলাদলি, মাস্তানি আর গুণ্ডা-বাজীতে দেশ ছেয়ে যায়। সোআক্রাতীস দুঃখে বলেছেন, অল্পবয়সীরা গুরুজনদের শ্রদ্ধা জানায় না, মর্যাদা দেয় না। বুদ্ধিমানদের চেয়ে খেলোয়ার, নাট্কে লোকের সম্মান বেশী। লোকে তাদের নিয়ে মাতামাতি করে, দলাদলি করে। এ কী মৌলিক অবমূল্যায়ন !···তাঁর লেখায় প্লাতো গুরুর ক্ষেদোক্তিটি প্রকাশ করেছিলেন। সোআক্রাতীস বিজ্ঞানী নন, বরং বিজ্ঞানকে মেটাফিজিক্সের বাতাবরণে ঢাকলেন। যা তিনি করতে চাইলেন, তা হলো গ্রীক জাতির নৈতিক ভূমিকে সুস্থিত-সুস্থ করা। তাঁর উপদেশ সে যুগের নেতাদের পছন্দ হয় নি ; সোআক্রাতীসের মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞাও হলো। তবু, নৈতিক উন্নতি ঘটে ; সোআক্রাতীসের শিক্ষায় গ্রীকরা একবার নতুন ভাবে জেগে ওঠে। একদিকে যেমন আসেন প্লাতো-আরিস্তোত্‌ল্, অন্যদিকে আলেকজান্দার ; এক রাজ্যে বাঁধা গ্রীসে সামগ্রিক উন্নতি ঘটে, শিল্পে সাহিত্যে এবং বিজ্ঞানে।

মেটাফিজিক্সের বেড়া কেটে গ্রীক বিজ্ঞান শাখাপ্রশাখা মেলতে পারে ; পারে না ম্যাজিকের ছোঁয়া বাঁচাতে। সেই ম্যাজিকের ছোঁয়া লেগে, তন্ত্র-মন্ত্রের দোহাই মেনে গ্রীস দ্রুত শেষ হয়ে যায়। বৌদ্ধ যুগের শেষে ভারতবর্ষে যা ঘটেছিল, তার পূর্ব স্মৃতি গ্রীসে, খৃষ্টীয় প্রথম শতকে পাওয়া যায়। এক হওয়া গ্রীস, অপবিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যায়।—রোমানরা নিমিত্ত মাত্র। রোম বিজয়ের আগে গ্রীসের মৃত্যু ঘটে গিয়েছিল। হিরোর যন্ত্রের ম্যাজিক গ্রীসের যন্ত্রণা ! মানুষের উপকারে না এসে, যন্ত্র মানুষকে যে ভুল পথে নিয়ে যেতে পারে, তার আদিমতম উদাহরণ পাওয়া গেল গ্রীসে। যে যন্ত্র মানুষের সৃষ্টি, যে যন্ত্র মানুষের সঙ্গী, সে যন্ত্রের চালক মানুষ। মানুষের হাতে মানুষের সামাজিক অবক্ষয়

দেখা দেয়। মানুষের হাতে মানুষের প্রশ্নোপনিষদ বিজ্ঞান নিঃশেষ হয়।—মানুষকে নিয়ে ভাবনা—সেও গ্রীসে, তার দুরন্ত যৌবনে আর তার গলিত শবদেহের সামনে। মানুষকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞান চিন্তা থাকে না।—এবং মানুষের চিরন্তন মৌলিক মূল্যবোধই অবিনশ্বর—যার ভিতের উপর সব কিছু দাঁড়িয়ে থাকে। বিজ্ঞানকে সেই মূল্যবোধটি প্রতিষ্ঠিত, সুস্থিত করতে এগিয়ে আসতে হবে—এই চিন্তাটি গ্রীসের পতন জানিয়ে দেয়। বিংশ শতাব্দীর নব বিজ্ঞানের চিন্তার অঙ্কুরটির বীজ ছিল গ্রীসের ইতিবৃত্তে। অনেক কিছু গ্রীস দিয়েছিল—তবে সবার বড় তত্ত্বটি জানা গেল এই শতকে, অনেক পরে। তা হলো—মানুষের মানুষ হবার ভাবনা।

হঠাৎ মেঘ

রোমেও গ্রীক ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো, তবে অধ্যাপকদের বিদেশ থেকে আমদানি করা হলো। এখানে পাঠ্য তালিকা সংক্ষিপ্ত করা হলো,—কারণ সিনেট মনে করে দর্শন বা ফিজিক্স অথবা পদার্থ-বিদ্যা, মেটাফিজিক্স বা অধিবিদ্যা, রাজনীতি আর ইতিহাস—এই চারটি বিষয়ে শিক্ষা সমাজে অবক্ষয় আনে, নাশকতার প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলে। অতএব রোম-বিদ্যালয়ে এই চারটি বিষয় নিষিদ্ধ। অন্যদিকে গ্রীক ঐতিহ্য অনুসরণ করে বাইজানতাইনরা ঐ সব বিষয়-শিক্ষাক্রম চালু রাখে। আলেকজান্দ্রিয়ার সার্থক প্রতিদ্বন্দ্বী স্কুলের প্রতিষ্ঠা হলো কনস্তান্তিনোপলে। ইতিমধ্যে মধ্য প্রাচ্যে বেরুটে একটি আইনের বিশ্ব-বিদ্যালয়ও স্থাপন হলো।

এথেন্সের আকাদেমির তখন টিমটিমে অবস্থা। অধ্যাপকরা পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী—কারণ রাষ্ট্র এবং নগরকর্তারা কয়েকজনের মাত্র

বেতন বহন করতেন। সেই বেতনটি কে যে বাগিয়ে নিতে পারবে তার জন্য অধ্যাপকদের যত চেষ্টা, পঠন-শিক্ষণে সেই প্রচেষ্টা তত কম। আর ছাত্রদের মধ্যে যে র‍্যাগিং পদ্ধতির কথা আজকাল শোনা যায়—তার আদিম উদাহরণ এই আকাদেমিতে ঘটে। প্রত্যেক নতুন ছাত্রকে স্নানাগারে আচ্ছা করে চুবিয়ে ডুবিয়ে তার কাছ থেকে ভূরি ভোজের টাকা আদায় করা হতো।—নতুন ছাত্রদের সম্বর্ধনাটি কিন্তু মোটেই শুকনো ছিল না।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টানধর্ম মঠের কুক্ষিজাত হয়ে দাঁড়ায়। গ্রীসের জড়বিজ্ঞানের সঙ্গে বাইবেলের জেনেসিসের বিবাদ উপস্থিত হয়। ছয় শতকে রোমান নেতা জাস্টিনিয়ান আইন কানুনের পরিবর্তন করে কিছুটা সামাল দিতে চেষ্টা করেন; বিবাদ কিন্তু কমে না। দু'বছর পর ৫২৯ খৃষ্টাব্দে এথেন্সের আকাদেমি বন্ধ করে দেয়া হলো—কারণ হিসেবে জানানো হলো,—অবক্ষয়-বিধ্বংসী শক্তির কেন্দ্র হলো এটি। থালীসের নয়শ বছর পরে, মূল গ্রীকভূখণ্ড থেকে গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান বিতারিত হয়ে গেল!

ছাত্রদের অশ্রদ্ধা অবজ্ঞা, গুরুজন শ্রদ্ধেয়দের প্রতি অবহেলা গ্রীক শিক্ষকরা দেখেছিলেন। প্লাতোর লেখা থেকে জানতে পারি সোআ-ক্রাতীস সেই ক্ষেদোক্তি করেছিলেন। তবে ছাত্রদের, তরুনদের সামগ্রিক অবক্ষয়ের কথা জানা যায় জাস্টিনিয়ান আর রোমান সেনেটারদের ফতোয়াতে। সরকার থেকে দু-তিনজন অধ্যাপক মাত্র বেতন পেতেন। সে যুগে একজন শিক্ষককে সব বিষয় পড়াতে হতো। গ্রীক রীতিতে বিষয় অনুসারে অধ্যাপক নিয়োগ হতো না। বাকি অধ্যাপকদের ছাত্র-দের কাছ থেকে, বণিক-রাজপুরুষ ইত্যাদির কাছ থেকে অর্থ চেয়ে, দান নিয়ে রোজগার করতে হতো। অতএব সবারই ইচ্ছা সরকারের কাছে নিজের জন্য তদবির করা; প্রমাণ করা শিক্ষক হিসাবে তারা কত ভাল, কত ছাত্রপ্রিয়। ঐ দ্বিতীয় প্রমাণের জন্য অধ্যাপকরা মাস্তান জাতীয় ছাত্রদের সঙ্গে সমঝোতায় এলেন। কোনো নতুন ছাত্র এথেন্সে এসেছে খোঁজ পাওয়া গেলে অধ্যাপকদের পোষ্য ছাত্রদের কাজ হলো তাকে

অন্যদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চ্যাংদোলা করে তাদের অধ্যাপকের ক্লাসে ঢুকিয়ে নামধাম নথিভুক্ত করা ; বাস, অধ্যাপকের ছাত্র বৃদ্ধি ঘটে আর বৃত্তির জন্য তদবিরের হাতিয়ার জোটে। জাস্টিনিয়ান বললেন,এথেন্সের দর্শনের স্কুলে পড়ানো ছাড়া আর সব কিছু হচ্ছে ; অতএব এরা যে বাইবেলের বিরোধিতা করবে তাতে আর আশ্চর্যের কি? ওরা নিজেরা কি কিছু জানে যে পড়াতে পারবে?···গ্রীক শিক্ষার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি রোমানরা ছুঁড়ে দিতে পেরেছিল সেদিন—তার কারণ শিক্ষাক্ষেত্রে সামগ্রিক অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল। ফলে বিজ্ঞানের সঠিক চিন্তাকেও রুদ্ধ করে দেয়া হলো। অন্যদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে রোমানদের অবদান প্রায় শূন্য। তারা যোদ্ধা আর শাসক। যুদ্ধ আর শাসন কার্যের জন্য যতটুকু জ্ঞান-বিজ্ঞান দরকার তার বেশী নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। রাস্তা ঘাটের উন্নতি তারা ঘটালো ; মিশরের জলসেচ পদ্ধতির সংস্কার করল ; আইন কানুনের ভিত্তি স্থাপন করল। বাস ! অঙ্ক-জ্যামিতি-বিজ্ঞান-যন্ত্র নিয়ে চিন্তা করল না। যেটিতে তাদের আকর্ষণ, তা হলো জ্যোতিষ। জুলিয়াস সিজারকে জ্যোতিষী যে সাবধান বাণী শুনিয়ে ছিল তার খবর শেক্সপিয়র মারফত সবারই তো জানা !······বিরাট সাম্রাজ্য থেকে রোমানরা দাসদের নিয়ে এল। রোম সাম্রাজ্যর পতনের কারণ জানাতে সব ঐতিহাসিকরাই ঐ অপর্যাপ্ত দাসদের কথা বলেছেন। দাসপ্রথা গ্রীসে অগ্রগতির বাধা হয়ে দাঁড়ায়, ইজিপ্টেব ভিত নাড়িয়ে দেয়। রোমেও সেই একই ইতিহাস। দাস নির্ভর হওয়া মানে তথ্যের সততায় সন্দেহ, বিজ্ঞানের পরীক্ষা নিরীক্ষায় ফাঁকফোকর। নিজেরা কাজ জানেনা, যে তথ্য পাওয়া গেল তাকে চিন্তা সূত্রে গেঁথে তুলতেও আলস্য। অনেক দাস। তারা কে কোথায় যায়, কি কাজ করে,তার খোঁজ নেই। বিজ্ঞানী জোনস (*A. H. M Jones*) পতনের আরেকটা কারণ জানালেন ;—বললেন, পুরনো টেকনোলজির উপর নির্ভরশীলতা এই পতনের গতি দ্রুততর করে। একটি কাজে অনেক লোক লাগানো হলো ; তাদের সংহতি বজায় রাখতে সৈন্যদের প্রয়োগ হলো। আর দেখা গেল আসল যুদ্ধের কালে সৈন্যের ঘাটতি। দাস খাটিয়ে সৈন্যরা যুদ্ধের উদ্যম হারিয়ে ফেলে।

তাই উত্তর থেকে জার্মান আর স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ান নোর্সরা যখন রোমসাম্রাজ্য আক্রমণ করে তখন সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে যায়—ছোট ছোট ফিউডাল স্টেটে ভেঙে যায়। আর আক্রমণ আসে আরবে গড়ে ওঠা এক নতুন ধর্মের অনুসারীদের কাছ থেকে। এরা মুসলমান, মহমেডান। নতুন ধর্ম, নতুন জাত মুসলমানরা। এরাও যেন নব গ্রীক। নতুন সভ্যতার স্বাদ পেয়ে তেমনি শিশুর কৌতূহল ; সর্বত্র যাবার আগ্রহ। সেখানে স্বচ্ছলতা দেখা দেয় নি, দাসপ্রথা আসেনি। এই নতুন সমাজের তখন একটি মাত্র কাম্য—দল বাড়ানো, ধর্মান্তর ঘটানো। ৬৪০ খৃষ্টাব্দে আরবরা মিশর জয় করে। আলেকজান্দ্রিয়া-পাঠাগার পুড়িয়ে ফেলার একটা চালু গল্প আছে। খলিফা ওমর ঐ কুকর্মটি করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে বর্তমানে সংশয় দেখা দেয়। ৯৭২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আলেকজান্দ্রিয়াতে যে গ্রীক দর্শন শিক্ষা দেয়া হতো এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। এরপর কাইরোতে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।—হয়তো তখন আলেকজান্দ্রিয়া খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয় বলে ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়।

ইতিমধ্যে মুসলমানরা একশ বছরে দ্রুত আরব ছাড়িয়ে পূবে পশ্চিমে হানা দেয়। স্পেন আর ফ্রান্সে হাজির হয়। ৭৩২ সালে তুরের যুদ্ধে চার্লস মার্তেলের কাছে হেরে তাদের গতিপথ ইউরোপে রুদ্ধ হয়। তারপর তারা থাকে স্পেনে। সেখানে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বাইশ বছর আগে কর্দোভাতে প্রতিষ্ঠা করে তাদের সংস্কৃতি-কেন্দ্র—বিশ্ববিদ্যালয়। এরও একশ বছর আগে একজন বাইজানতাইন সম্রাট গ্রীক গ্রন্থের একটি সামগ্রিক সংগ্রহ বোগদাদের খলিফার কাছে পাঠান।—সিরিয়ান খৃষ্টানদের দিয়ে খলিফা এসব গ্রন্থের আরবী অনুবাদ করেন। কর্দোভাতে সেই সব গ্রন্থের প্রতিলিপি রইল।

১১৩৬ সালে তৃতীয় ফার্দিনান্দ কর্দোভা জয় করলেন। আর শেষমেশ পঞ্চম ফার্দিনান্দ এবং ইসাবেলা স্পেন-পর্তুগাল থেকে মুসলমানদের হঠিয়ে দিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুসলমানরা ইউরোপ ছেড়ে গেল। একটি স্মৃতি শুধু থেকে গেল—গ্রীক বাইজানতাইন বিশ্ববিদ্যালয়ে এক

অধ্যাপক অনেক বিষয় পড়াতেন। মুসলমানরা জানতো মানুষের মস্তিষ্ক যত বড়ই হোক না কেন বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার একজন মানুষের পক্ষে অনেক বেশী—এক মাথায় তাকে ধরানো যাবে না। অধ্যাপকদের শ্রমবিভাগ কর্দোভা-আল-আজহারে দেখা দিয়েছিল। আর সেই পথ ধরে দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে যে সব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হলো—যেমন ফেজ, প্যারিস, অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজ—সেখানে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য বিভিন্ন অধ্যাপক এল।

আরো কিছু পাওয়া গেল আরবদের কাছ থেকে!

মেঘে ঢাকা আলো

মুসলমানরা নতুন ধর্মের নতুন জাতি। তাদের নিজস্ব কোনো বিশেষ জ্ঞান-বিজ্ঞান বা সংস্কৃতি ছিলনা। ধর্মীয় সমস্যার সমাধানের পর তাদের কাছে আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনার কিছু রইলনা। এক হয়ে লড়াই করার শিক্ষা তারা ধর্ম থেকে পেল। নতুন জাতি বলে তৈরি করল নতুন নগর; নতুন তার স্থাপত্য রীতি —যেখানে প্রাচ্য-প্রতীচ্য এক হয়ে মেলে। খোলা মনে, খোলা চোখে, তারা চীন-ভারত-গ্রীক-লাতিন সব ভাষার শিক্ষা একই মর্যাদায় একই আসনে গ্রহণ করে। বিশ্বজনীনতার সূচনা দেখা দেয়—যে বিশ্বজনীনতা হলো বিজ্ঞানের অভিজ্ঞান। উৎসাহী, উদগ্রীব, আগ্রহী মুসলমানরা হাতের কাছে যা পেল তা নিয়ে কুড়িয়ে বাড়িয়ে অনুবাদ করে নিজেকে শিক্ষিত করে তোলে। যাকে বলা হয়



লিওনার্দো দ্যভিঞ্চি

এনসাইক্লোপীডিস্ট—তার সুন্দর নিদর্শন হলো মুসলমানরা ; আর তার বিশেষ ব্যক্তিত্বটি হলেন অভিসেন্না (*Avisenna*-980 1037)।
মরুভূমির বাসিন্দা বলে মুসলমানরা কৃষি ছেড়ে বাণিজ্যে বেশী মন দিয়েছিল। বিনিময়, সুদ, সম্পত্তি বাঁটোয়ারাথেকে আরম্ভ করে ডিপ্রীশিয়েশন বা অবচয় মূলক গণিতে তারা এতই পারদর্শী ছিল যে ক্রীতদাসীর বয়স বাড়লে তার কত দাম হতে পারে সে সম্বন্ধে তাদের একটা চমৎকার সারণী ছিল ! সংখ্যা নিয়ে তারা ভাবলো। ভারতীয় দশমিক ভিত্তিক রাশির প্রচার তাদের হাতে। গণিতবিদ আলখ্বারিজমির কাছ থেকে এলজেব্রার রীতি জানা গেল। তিনি জানালেন সমীকরণের অজানা রাশিকে বলা হবে রুট বা মূল আর বর্গ-ঘন জানাতে বলা হবে পাওয়ার (*Power*)। এছাড়া ছিলেন কবি-গণিতবিদ ওমর খৈয়াম। কিউবিক ইকুয়েশনের সমাধানের রীতি তিনিজানালেন আর বিখ্যাত কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের সমস্যার একটা সমাধান দিলেন। তাছাড়া যাকে ইমেজিনারি রাশি বলে, তার দেখা পেয়ে ভয়ে দুর্ভাবনায় বেশ কয়েকটা রুবাই লিখে ভয়মুক্ত হলেন।
মুসলমানরা ট্রিগনোমেট্রি আর জ্যোতির্বিদ্যা বা আস্ট্রোনমির চর্চা করল। কারণ চান্দ্র মাস মানতো বলে, পবিত্র দিনক্ষণ ঠিক করতে ঐ দুটো শাস্ত্রের যথারীতি চর্চার প্রয়োজন দেখা দিল। প্রার্থনার জন্য জপমালা যেমন তৈরি করল, তেমনি করল কিছু কিছু জ্যোতির্বিদ্যার যন্ত্র—যা পুরনো গ্রীক-হিন্দু-চীনেদের যন্ত্র থেকে ধার করে তৈরি করা। এখানেও সমন্বয় দেখা দিল। আর তারাই প্রথম দক্ষিণ গোলার্ধের নক্ষত্রপঞ্জির কথা জানালো !
জ্যামিতি নিয়ে তারা ভাবল। এমনকি নাসির আল-দিন যুক্তি দিয়ে বিচার করে সাকেরি-গাউসের আগে নন ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতির কথা ভাবেন। এটি একটি বিস্ময় !
স্থাপত্যে বাইজানতাইন, শিল্পে তারা স্তুপ-ইগলু-আর্চ সব মিলিয়ে গম্বুজ তৈরি করে, মিনার খাড়া করে। ইজিপ্টের পুরনো খালের সংস্কার করে ; ইরাকের জলসেচন ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করে। সবার চেয়ে বড় কাজ

হলো স্পেনে কর্দোভায় গ্রীক পুঁথিপত্রের অনুবাদ এবং তার উপর তাদের গবেষণা-আলোচনা ইত্যাদি নিয়ে একটি বিরাট পাঠাগার তৈরি করা। এখান থেকে চুঁয়ে চুঁয়ে গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপে হাজির হয়—ভুলে যাওয়া, ফেলে রেখে আসা বাইবেলের প্রডিগাল সানের মত উড়নচণ্ডে গ্রীক জ্ঞানের পুনরাবির্ভাবের স্মচনা দেখা দেয়।

মুসলমানদের হাত থেকে পুরনো পৃথিবীর জ্ঞান পাওয়া গেল। পাওয়া গেল সে যুগের নানা চিন্তাধারা যা পৃথিবীর পুরনো অংশের আনাচে কানাচে লুকিয়ে ছিল। সাম্রাজ্যের বিস্তার করতে গিয়ে আলেকজান্দার গ্রীক জ্ঞানকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, আবার তেমনি অন্য দেশের জ্ঞান আহরণ করে গ্রীসে পাঠিয়েছিলেন। মুসলমানরাও তাই করল। একদেশের রীতিনীতি, সাহিত্যদর্শন, যন্ত্র অথবা বিজ্ঞান অন্য দেশে গেল ; দেশান্তরের বেড়া ভাঙে, কালান্তরের সূচনা ঘটে। গ্রীক গণিত আর ভারতীয় গণিত মুসলমানদের হাতে একসূত্রে গাঁথা হয়। গ্রীক জ্যোতিষ আর ভারতীয় জ্যোতিষ নিয়ে মুসলমানী জ্যোতিষচর্চা শুরু হয় ; চীন আর পারস্যের যন্ত্র মুসলমানরা ইউরোপে নিয়ে আসে। মুদ্রা, মুদ্রণযন্ত্র, বারুদ, ঘোড়ার লাগাম, গিয়ার-পিনিয়ান, যা চীনের—তা আসে ইউরোপে বা প্রাচ্যের অন্যত্র। শূন্য আর দশমিক, ট্রিগনোমেট্রি, প্রাথমিক এলজেব্রার রীতিনীতি যা ভারতের, তা আলখ্বারিজমির হাত ঘুরে দেখা দেয় ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, ইউরোপে অথবা উত্তর আফ্রিকায়। ভাবের আদান প্রদান যেমন ঘটে, তেমনি ঘটে সম্প্রসারণ। গ্রীক জ্যামিতি আর জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে মুসলমানরা আলোচনা করেন, প্রশ্ন তোলেন। টলেমির আকাশকে মুসলমানরা মানলো, তাকে ইউরোপে ভারতে ছড়িয়ে দিল। অন্য দিকে জ্যামিতি নিয়ে প্রশ্ন তোলে। তবু, এ সব প্রশ্ন যেন প্রক্ষিপ্ত। মুসলমানদের কৃতিত্ব হলো সব তথ্য নিয়ে সাজি ভরিয়ে তোলা। যেমন তাদের স্থাপত্য, তাদের আরব্য রজনীর গল্প, পারস্যের উপকথা। সব দেশের সব কথা সব ভাবনা নিয়ে তারা গল্প গুজব করে গেল। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মত তারা অভিজ্ঞতার পুঁজি ভরিয়ে তোলে, তাকে বিজ্ঞান দিয়ে সুসংস্কৃত করতে চাইল না ; যেমন

করেছিল গ্রীকরা। গ্রীক জ্ঞানের পুনরাবির্ভাবে বিজ্ঞান চিন্তা আবার দেখা দেয়। মেসোপটেমিয়া-মিশরের প্রতিবাসী আরব—তথ্য জোগাড়ে মশগুল হলো; আর গ্রীসের প্রতিবেশী ইউরোপে শুরু হয় নতুন করে প্রশ্ন তুলে আলোচনায় নামা !

বাথশহরের আডেলহার্ড (*Adelhard*) লুকিয়ে ছদ্মবেশে কর্দোভাতে গিয়ে ১১২০ সাল নাগাদ ইউক্লিডের একটি বই কোনো মতে চুরি করে এনে তার লাতিন অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাছাড়া আলখ্বারিজমির ট্রিগনোমেট্রিকেও লাতিন জগতে আনেন। চেস্টারের রবার্ট স্পেনের টলেডোতে পড়তে গিয়ে ১২৪৫ সালে খ্বারিজমির আলজেব্রার অনুবাদ প্রকাশ করেন। আর ইটালির জেরার্ড (*Gerard*) দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রকাশ করেন টলেমির আলমাগেস্ট, কিছুটা আর্কিমীদিস, আরিস্তোত্‌লের কিছু অংশ আর মুসলমান বিজ্ঞানীদের অনেক রচনা।

ইতিমধ্যে মুসলমানী ইঞ্জিনিয়ারিং তথ্য—যেমন উইণ্ডমিল, ওয়াটার মিল, গিয়ার-পিনিয়ন—যা তারা সাম্রাজ্য থেকে নিয়ে এসেছিল—সে সব ইউরোপে চালু হয়। ঘোড়ার লাগাম দেবার সঠিক পদ্ধতি চীনের থেকে ইউরোপে আনে মুসলমানরা। আর জানায় দোফসলা জমির কথা—আখ আর তুলোর চাষ।

তারপর মেঘ ঢাকা অন্ধকার হঠাৎ যেন দূরে সরে যায়। একটু আধটু আলোর রেখা, যা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছিল, মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ সেই আলোয় ভরে ওঠে। দক্ষ শিল্পীর হাতে নতুন যন্ত্রের সৃষ্টি হয়। মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ জয়, আর ক্রুসেডের অভিযানের ফলে, ইউরোপ অভিযাত্রী হয়। দশ শতকে নর্থম্যানরা আইসল্যাণ্ড পার হয়ে উত্তর আমেরিকার তুষারাবৃত অঞ্চলে হাজির হয়; মুসলমানদের সঙ্গে ইউরোপীয়রাও যায় পশ্চিম আফ্রিকায়। ধীরে ধীরে সমুদ্র অভিযানের উন্নতি ঘটে; চুম্বক কম্পাসের হাজিরা দেখা দেয়; দাঁড় হালের পরিবর্তন ঘটে। গ্রীক বিজ্ঞানের পুনরাবির্ভাবে নতুন শিল্পী সমাজের আবির্ভাব ঘটে। এরা বর্গ বা দুর্গের বাইরের বণিক সমাজ—বুর্জোআ। সমাজে এদের নতুন প্রতিষ্ঠা ঘটে। আর আবির্ভাব ঘটে একজন অসাধারণ মানুষ, লিওনার্দো

দ্যভিঞ্চির—যিনি একাধারে শিল্পী আর ইঞ্জিনিয়ার। স্বাধীন, সুদক্ষ যে শিল্পী দলের আবির্ভাব ঘটে তার সুন্দরতম নিদর্শন ইনি। গ্রীক যুগে প্লাতো ও আরিস্তোত্‌ল্ পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক ছিলেন। আর দ্যাভিঞ্চি এক শরীরে চারজন—একজন চিত্রী, একজন ভাস্কর, একজন বাস্তুবিদ এবং একজন ইঞ্জিনিয়ার। বোধি ও মননের সমন্বয়ে, চোখ ও হাতের সম ব্যবহারে, শ্রম ও বুদ্ধির সংযোজনে তিনি কুশলী শিল্পী, দক্ষ কারিগর। বিজ্ঞানীর চোখ দিয়ে তিনি সব কিছু দেখছেন আর শিল্পীর কল্পনা দিয়ে তাকে গড়ে তুললেন। রেনাসাঁসের সূচনাতে লিওনার্দো এলেন—আর আবার শুরু হলো বিজ্ঞান চর্চা। সেই আরম্ভের মঙ্গল আলপনাটি আঁকলেন লিওনার্দো দ্যভিঞ্চি।

আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনাও সেদিন। তাই বলা হয় আধুনিক বিজ্ঞান রেনাসাঁসের পরে দেখা দিলেও তার কোনো প্রভু নেই, সে শুধু মানে সনাতন ধ্রুব প্রাচীনত্বকে। মধ্য যুগের অকৃতজ্ঞ সন্তান হলো এই আধুনিক যুগ, আজকের কাল! আমাদের কাল!

আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার শুরুও সেই রেনাসাঁস যুগে। আর ইটালিতে দেখা দেয় বিজ্ঞানের নবউন্মেষ। এই বিজ্ঞান সচেতনতা হলো নগর কেন্দ্রিক ; বণিক সুদখোর, কারিগর—এরা তখন নগরে থেকে আশে-পাশের গ্রাম্যজনের উপর খবরদারী করছে। এদের হাতে অর্থ, এরা উঠতি বড়লোক, বুর্জোআ। এই অর্থ বা সম্পত্তি হাতে আসার দুটো ফল পাওয়া গেল। যে-শিল্প কারিগরি দক্ষতা তারা পেয়েছিল, কি করে তার উন্নতি আরো ঘটানো যায় সেই চেষ্টাতে তারা লাগল। আজকের দিনে $R\&D$—রীসার্চ এণ্ড ডেভলাপমেণ্টের শুরু তাদের হাতে। আর দ্বিতীয়টা হলো হাতে অবসর আর অর্থ থাকায় প্রাকৃতিক কৃত্রিম সব পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা ভাবনার শুরু। পুরনো জগতের মত ইটালীর এই সব নাগরিকরা বিজ্ঞানকে অন্য চোখে দেখে। মৃত জ্ঞান, ভুলে যাওয়া জ্ঞান নিয়ে ভাবনার একটা অহেতুক স্পৃহা যেমন জাগে, তেমনি তারা দেখে যা তারা করছে—তার থেকে এই ধারণা যেন আলাদা, কত ভিন্ন।

বড়লোকেরা প্রাচীন জিনিসের সংগ্রহে মাতে। খুঁজে পেতে খুঁড়ে গ্রীক

রোমান রুইনস (*Ruins*), স্থাপত্য, ভাস্কর, পাত্র নিয়ে মাতামাতি করাটা ফেশনেবল হয়ে দাঁড়ায়। কেউ কেউ হঠাৎ গ্রীক ভাষা শেখে, গ্রীক পুঁথি সংগ্রহে নামে। সংগ্রহ করা শুধু বাতিক নয়—এ হলো ধনসম্পত্তির বিজ্ঞপ্তি যেন। আধুনিক মার্কিনী ধনীদের মতো এরা প্রত্যেকে নিজের নিজের বাড়িতে সংগ্রহশালা গড়ে তোলে। তার পরবর্তী ধাপ হলো, পণ্ডিতদের নিয়োগ করে সেইসব পুঁথিপত্রের অনুবাদ ঘটানো। আসলে এই নতুন ধনীরদলের ইচ্ছা রোমান গ্রীকরা কিভাবে জীবনটাকে উপভোগ করেছে সেটা জানা, তার অনুকরণ-অনুসরণ করা। প্রথমেই অনুবাদ হলো গ্রীক সাহিত্য আর দর্শন—আর সেইপথে জানা গেল গ্রীকভদ্রলোকেরা কি ভাবতেন, কি করতেন। ইটালির ধনীরা গ্রীক ভদ্রলোক হতে চাইলেন—তবে সেখানেও কিছুটা বিভেদ দেখা গেল। সামাজিক পরিস্থিতি ভিন্ন হওয়ায় বুর্জোআরা গ্রীক রোমান সেনেটার হতে পারেনা। না পারুক; তারা হরদম নানা আলোচনা সভার উদ্যোগ করে চলে—যাদের প্লাতোর শব্দ অনুসরণ করে বলা হতো সিমপোসিয়াম। বাইরে মিল টানা গেলেও ভেতরে ভেতরে শিল্প-সাহিত্য-দর্শনে ফারাক থাকে। রেনাসাঁসে গ্রীক সভ্যতার বিচার হলো নতুন পরিস্থিতিতে, নতুন চোখ দিয়ে। এক-দেড় হাজার বছরে মানুষের চিন্তা অনেক পরিপক্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রীক চিন্তা মানুষের চিন্তা জগতে আলোড়ন তুললেও, সেই আলোড়ন অনেক দূর গেলেও, আলোড়ন একদিন নতুন সমাজে ধাক্কা খেয়ে আবার যখন ফিরে আসে, তখন নতুন ওঠা ঢেউয়ের রূপ পালটেছে। আলোড়ন আছে—তার চেহারা আলাদা।

এই সময়, শিল্পদর্শন অনুবাদের মধ্যযুগে, হঠাৎ তারা গুরুগম্ভীর বিষয়ের অনুবাদে নামে; আসে গণিত, আসে বিজ্ঞান। পেট্রনরা দেখেন এই গণিত আর বিজ্ঞান তাদের কারিগরি দক্ষতাতে বেশ লাগে; লাগে বাস্তুবিদ্যায়, জাহাজ চালানোয়, বাণিজ্যের লেনদেনের কালে। এই যে-ইন্টারেস্ট—এরই প্রেরণায় পেট্রন-পণ্ডিতরা গ্রীক গণিতবিজ্ঞান নিয়ে মেতে ওঠে। প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল, ঐ পথে রোজগারের হার বাড়ানো যায়

কিনা। তারপর, হঠাৎ তা নিছক জ্ঞানস্পৃহাতে সঙ্কুচিত হয়। জেনোআ বা ভেনিস—ছুটি বাণিজ্য কেন্দ্র নবশিক্ষার ছুটি কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। ইউরোপের রুপো বাইরে যায়, পরিবর্তে আসে সোনা। সোনার মজুত-দার বণিকরা কবি শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন ; তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থও ঢালেন—কারণ পুরনো গ্রীকদেবতা আর বীররা এ রকমটিই তো করেছিল।

রুপোর রপ্তানির জন্য আরেক দিকে কারিগরি দক্ষতা বাড়ে—খনি নিয়ে ভাবনা। আরবদের উইণ্ডমিল, ওয়াটার মেসিন, চীনেদের গিয়ার-পিনিয়নের সঙ্গে আর্কিমীদিসের তত্ত্বের একটা গাঁটছড়া বাঁধা হয়। আর এই পথে বস্তুর গতি সম্পর্কে একটা ধারণা জাগে—যে ধারণাটা নতুন, যার ব্যবহারকে ঠিক গ্রীক চিন্তার ছকে ফেলা যায় না।

গ্রীক চিন্তা চমৎকৃত করল, আবার সংশয় জাগালো। পুরনো তথ্য জেনে নতুনকে দেখার সময় তারা যে চোখ দিয়ে দেখে তা লিওনার্দো দ্যভিঞ্চির চোখ—যে চোখে শিল্প-বিজ্ঞানের মেলবন্ধন ধরা দেয়।···এই নব বিজ্ঞান চিন্তার সূচনা হলো জার্মানিতে একটি জ্যাঠা-পাকা ছেলের হাতে। নাম রিজিওমানটেনাস (*Regiomontanus*)। পনের বছরে ছেলেটি প্রাশিয়ার সম্রাট তৃতীয় ফ্রেডরিখের রাজ জ্যোতিষী হলেন। টলেমির আলমাগেস্টের একটি সংক্ষিপ্ত সম্পাদনা প্রকাশ কর-লেন, ট্রিগনোমেট্রিকে আধুনিক যুগে পৌঁছে দিলেন। সে যুগে জার্মানিতে কারিগরি শিল্পের কেন্দ্র হলো ন্যুরেমবার্গ। রেনাসাঁসের যুগে ন্যুরেমবার্গের শিল্প আর যন্ত্রের বেশ চাহিদা। জাহাজী যন্ত্র, ঘড়ি আর নানা সূক্ষ্ম যন্ত্র তৈরি করে বেহিমের (*Behaim*) নাম যশ সারা ইউরোপে। এই ন্যুরেমবার্গে রিজিওমোনটেনাস একটা বীক্ষণাগার-অবজারভেটরি তৈরি করে আকাশবস্তু দেখতে শুরু করলেন। তারকা গ্রহের অবস্থান আর সময় বিচারে স্থিরনক্ষত্রের পরিপ্রেক্ষিত চিন্তা আনলেন; আর মাপজোকে ট্রিগনোমেট্রির ব্যবহারটিকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। দেখা—সঠিকভাবে দেখা, আর বারবার একই দেখার পথে জ্যোতির্বিদ্যার পরিসরের বিস্তৃতি তিনি ঘটালেন না। যা পাওয়া গেল, তা হলো তথ্য জোগাড়ে ত্রুটিহীন-

তার সূচনা ; আর তথ্য থেকে সম্পর্ক সম্বন্ধ খুঁজতে গণিতের ব্যবহার। আর্কিমীদিস যার শুরু করেছিলেন, রিজিওমোনটেনাস তার পুনরাবৃত্তি করলেন। এঁর ছাত্র নোভারা (*Novara*) এই দেখাকে আরো বিস্তারিত করলেন। তিনিও জ্যোতিষী করে রোজগার করলেন; আর আকাশ দেখলেন। টলেমির জানানো তারকার অবস্থানটি নতুন করে বিচার করতে গিয়ে তিনি দেখেন হাজার বারশ' বছরে টলেমির আকাশ আর সেদিনের আকাশের ছক এক নেই—তারকাদের অবস্থান এক জায়গায় নেই। পুরনো দিনের পৃথিবীর সভ্যতা যেমন পালটেছে—আকাশের চেহারাও পালটায়। এই যে নতুন করে আকাশের সাজিয়ে ওঠা—এ যে কেন—নোভারা তা জানেন না। এর কারণ জানা গেল নিউটনের কাছ থেকে। পৃথিবীর লাট্টুর মতো ঘোরার জন্য পৃথিবীর কক্ষপথের পরিবর্তন যে ঘটে সে সংবাদ গণিতের ছকে নিউটন জানালেন—সে প্রায় দুশোবছর পরে।

তার আগে নোভারার ছাত্র কোপার্নিকাস নতুন বিজ্ঞানের ভগীরথ হয়ে দেখা দিলেন। এই কোপার্নিকাসের হাতে গ্রীক বিজ্ঞানের উপনয়ন ঘটে। বিজ্ঞান দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়ে নতুন চিন্তাধারার অধিকারী হয়। বিজ্ঞানের সত্যিকারের পুনরভ্যুত্থানের শুরু কোপার্নিকাসের হাতে। রিজিওমোনটেনাস আর নোভারা শুধু প্রস্তুতির আয়োজনটুকু করে ছিলেন।

দ্বিতীয় পর্ব ঃ আকাশের হাতছানি

অতীতের বন্ধন ছিন্ন করে যে কোকিল পাড়ি দেয়, সেই নববসন্তের দূত হলেন কোপার্নিকাস। ভিশচুলা নদীর ধারে তেরুন শহরে বাল্‌টিক অঞ্চলে ১৪৭৩ সালে জন্ম। সচ্ছল ধনীপরিবারের ছেলে—বাবা ছিলেন ফাইনেন্সার আর তামার ব্যবসায়ী। দশবছরে বাবাকে হারালেন কোপার্নিকাস। আর তারপর মামা, ভারমিয়ার বিশপ লুকাস ওয়াটৎসেল রোডের তত্ত্বাবধানে বড় হয়ে ওঠেন। ভারমিয়া—প্রাশিয়ার ভারমিয়া—গ্যেটের স্মৃতিবিজড়িত। প্রাশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল হলো ভারমিয়া; আর আক্ষরিক অর্থে তার শাসক হলেন এই বিশপ মামা। মামা ক্রাকো আর বোলানাতে পড়েছেন। পোলাণ্ডের ইতিহাস আর আইনে অভিজ্ঞ। কোপার্নিকাসের জন্য সেই একই রাস্তার কথা তিনি ভাবলেন। স্নাতক হবার আগে চব্বিশ বছর বয়সে তাঁর জন্য একটি কাজের বন্দোবস্থ করলেন তিনি—ফ্রাউনবার্গ ক্যাথিড্রেলের কেননের চাকরি,—প্রশাসন আর আয়ব্যয়ের দিকটা দেখতে হবে। চিরজীবনের জন্য কোপার্নিকাসের অর্থচিন্তার মুক্তি ঘটে গেল। তারপর ১৪৯২ সালে ক্রাকো বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা নিতে তিনি গেলেন।—সেই ১৪৯২ সালে, যে বছর কোপার্নিকাস বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানের রাজ্যে পা রাখলেন, সেই বছরে আর একজন নতুন



কোপার্নিকাস

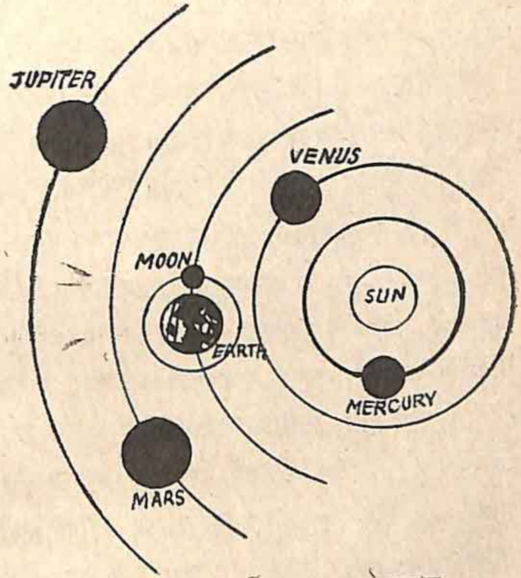
রাজ্যে পা ফেললেন—তিনি জেনোআর ক্রিস্টোফার কলম্বাস; আটলান্টিক পার হয়ে সে বছরে তিনি হাজির হলেন আমেরিকায়। শিক্ষার শুরুতে নতুন জগতের হাওয়া ইউরোপে ভেসে আসে। পুরনো গ্রীক জ্ঞান আর নতুন পৃথিবীর হাতছানি ইউরোপকে উত্তাল করে তোলে। জাহাজ নিয়ে অভিযানে ইউরোপীয়রা বেরিয়ে যায়; আর জানে পৃথিবী গোল ;—যেখান থেকে যাত্রা শুরু, সারা পূব পশ্চিম ঘুরে আবার সেখানে আসা যায়। তবে পৃথিবী কি আকাশের স্থির বস্তুর মতো কিছু? এই প্রশ্নের ফিসফিসানি ওঠে।···ক্রাকোতে কোপার্নিকাস গণিত শিখলেন, শিখলেন গ্রীকভাষা, আর জ্যোতির্বিজ্ঞান। চার বছর ক্রাকোতে কাটিয়ে গেলেন ইতালির বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সেখানে তিনি অন্য পরিবেশে ভিড়ে গেলেন। উত্তর ইউরোপের ক্রাকোতে ছিল আঁটসাঁট বিদ্যাপীঠের আদল। আর বোলোনা, ইতালির বোলোনাতে তখন নতুন পুরবৈঁয়া হাওয়া বইবার শুরু। রেনাসাঁসের সন্ধিক্ষণে ইতালিতে শিল্প-সাহিত্য, যন্ত্র-কারিগরি আর জাহাজী অভিযানের হাঁকডাক। লিওনার্দো দ্যভিঞ্চি, র্যাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো, সিজার বর্জিয়া আর অন্যান্যরা এবং মাকিয়াভেলি ইতালিকে সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু করে তুলেছে। নাগরিকরা মুক্তহস্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে টাকা ঢালেন—দেশবিদেশের সুবিখ্যাত অধ্যাপকদের সাদরে ডেকে আনেন। এই বোলোনাতে আরো চার বছর কাটালেন কোপার্নিকাস—গণিত আর গ্রীক ভাষায় সুদক্ষ হয়ে উঠলেন। মূলভাষায় গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা করলেন তিনি।

বোলোনাতে তিনি বিখ্যাত নোভারার কাছে পড়ার সুযোগ পেলেন। ১৪৯৭ সালে দুজনে আলডেবারান নক্ষত্রপুঞ্জে একটি তারার গ্রহণ দেখলেন—গ্রহণের কারণ চাঁদ। এই দেখা থেকে কোপার্নিকাসের মনে চাঁদের গতিপথের অন্য ধারণা জাগে। এই পথটি টলেমির এপিসাই-কেল পথ সর্বদা মেনে কি চলে?—এটি হোল প্রশ্ন!

১৫০০ সালে রোমে ক্রিশ্চানদের জুবিলি উদযাপন হলো। সেই উৎসব দেখে ১৫০১ সালে আইনের ডিগ্রি না নিয়ে কিছুদিনের জন্য দেশে

ফিরলেন—আর হলেন চিকিৎসক। জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা থেকে ডাক্তার বনা সে যুগে সম্ভব ছিল—কারণ জ্যোতির্বিজ্ঞান শেখায় বড় আর ছোটর ধারণা—মাইক্রোকসম-মেক্রোকসমের তত্ত্ব।—আর এই তত্ত্বই তো দেহতত্ত্বের সহজিয়া ধারণার মূল সূত্র। কোপার্নিকাসের ডাক্তার হবার বাধা কোথায়? তবুও কদিন পর আবার বিদেশ যাত্রা। এবার পাদুআ বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান শিখলেন আর ফেরারাতে শিখলেন আইন। সব মিলিয়ে দশ বছর নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়ে আইন, চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিত,জ্যোতির্বিজ্ঞানকে আয়ত্ব করে ফিরে এলেন। আর জানলেন গ্রীকভাষা, লাতিন ও ছবি আঁকা।



কোপার্নিকাসের সৌরজগত

ফ্রয়েনবার্গে ফিরে স্থিতু হয়ে মামার সহকারী হয়ে শাসনকাজে নামলেন। আর অবসর সময় করেন জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা। একটি মিনারে তিনি সাদামাটা বীক্ষণাগার গড়ে তুলে আকাশ দেখেন। তবে সে দেখা নিয়মিত নয়। তবু যা দেখেন তার ফলাফলে নতুন তত্ত্বের বীজ ধরা পড়ে। জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসেবে অতএব তাঁর নামডাক ছড়িয়ে পড়ে। ১৫১৪ সালে একচল্লিশ বছর বয়সে রোমে ক্যালেণ্ডার পরিমার্জনা কমিটির একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে ঘুরেও এলেন। বেশ চলেছে। অর্থ সম্মান প্রতিপত্তি,—নিজের কাজের বাইরে আকাশ দেখার জন্য অবসর—আর কি চায়? বই লেখা? সেও একটা লিখলেন। গ্রীক সাহিত্যের

একটি লাতিন অনুবাদ করলেন ১৫০৯ সালে। ভূমিকায় তাঁর অধ্যাপক ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞানে জ্ঞানের কথা জানালেন।
এই সময়ে টিউটনিকরা যখন ফ্রয়েনবার্গের আলেস্টাইন ক্যাসেল দখল করতে আসে, শাসক হিসেবে সৈন্যদলের নেতৃত্ব দিয়ে জয়ীও হলেন। অতএব শাসকসমাজ এই সর্বজ্ঞ লোকটিকে আরেকটি কাজ দিলেন। —আমেরিকা থেকে লুটে আনা সোনায় ইউরোপের বাজার তখন বিপর্যস্ত। এই বিষয়ে মোকাবিলার জন্য কোপার্নিকাসকে রিপোর্ট দিতে বলেন। হবু বিজ্ঞানী সেদিন অর্থনীতিবিদ হয়ে দেখা দেয়। গ্রীশমের আগেই তিনি ঘোষণা করেন বাজে টাকা (*Bad money*) ভাল টাকা (*good money*) কে হটিয়ে দেয়। মুদ্রাস্ফীতির কারণ হলো, সামাজিক অব্যবস্থা, রোগ ও মরকের প্রাদুর্ভাব আর দারিদ্র্য। হঠাৎ গজিয়ে ওঠা টাকার ফলে লোকের কর্মস্পৃহা নষ্ট হয়, মুদ্রামূল্য কমে—সমাজে ধন বৈষম্য দেখা দেয়। তিনি বললেন,এই মুদ্রাস্ফীতির কিছুটা নিয়ন্ত্রণ ঘটে—যদি সমগ্র প্রাশিয়ায় একটি মাত্র মিণ্ট থাকে—একটি মাত্র মুদ্রা ব্যবস্থা চালু থাকে।—বিজ্ঞানী হবার আগে কোপার্নিকাস অর্থনীতিবিদ হয়ে দাঁড়ান। প্রশংসা করলে লাজুক মুখে বলেন, নতুন কিছু বলেননি—গ্রীক আরিস্তোফানীসের চিন্তায় এর মূল ছিল।—ছিল কি ?
কোপার্নিকাস এক অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব। শাসক, অর্থনীতিবিদ, সমরবিশারদ ; —তিনি শুধু পণ্ডিত নন, ভাষাবিদ নন ; রেনাসাঁস যুগে শুধু নয়, আজকের যুগেও তাঁর তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না।
আর এরপর ১৫৩৬ সাল থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞান নিয়ে,নতুন তত্ত্বের দ্বারে পৌঁছে চুপি চুপি একটি বই লিখতে শুরু করলেন—স্বর্গ গোলবস্তুর চক্র ভ্রমণ নিয়ে চিন্তা—*Concerning the Revolution of the Heavenly Spheres*—এখানে তিনি চক্রভ্রমণ শব্দটি বোঝাতে জানালেন *Revolution* শব্দটি—যার বর্তমান অর্থ বিপ্লব ! এই বিপ্লবের শুরু হলো তাঁর হাতে।
গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে তিনি ভেবেছেন। ভেবেছেন ঋতুচক্র কেন হয়, কেন.দিন রাত্রি ঘটে। জেনেছেন গ্রীকদেরও এ নিয়ে চিন্তা ছিল।

সিসেরো (*Cecero*) প্লুতার্ক,হেরাক্লাইডীস (*Heraclides*) এরা ভাবতেন মূল আগুন, যার সীমা ও শুরু সূর্য, তার চারদিকে ঘোরে পৃথিবী ; আর হেরাক্লাইডীস ও এনফানটৃস ভাবতেন পৃথিবীর আছে অক্ষগতি—যেমন একটি চাকা তার অক্ষধুরার চারদিকে পাক খায়। আরিস্তারকাসের সৌরকেন্দ্রিক গ্রহলোকের অনুবাদ তখনো প্রকাশ হয় নি। এই সব অজ্ঞেয় তত্ত্ব নিয়ে, নিজের জানা তথ্যের সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য তিনি খুঁজে পেলেন। জানালেন এই গ্রহলোক সৌরকেন্দ্রিক, পৃথিবীর আছে অক্ষগতি। গ্রহদের পথ বৃত্তাকার। তবু বইটি তিনি প্রকাশ করলেন না— কারণ যাজক কোপার্নিকাস জানেন, যা তিনি বলতে চাইছেন, তা সেকালীন ধর্মজগতের চিন্তা ভাবনার বিপরীত। ক্রিশ্চানজগৎ পৃথিবীকেন্দ্রিক বিশ্বলোক মানে, মানে আকাশে নির্দিষ্ট সংখ্যক তারকা নির্দিষ্ট অঞ্চলে আছে। বিশ্বলোক প্রকাণ্ড নয় ; আর এই পৃথিবী মাটি পাথরে গড়া বলে প্রচণ্ড ভারি—অন্য গ্রহতারা আগুনে ভরা বলে হালকা। তারা নড়তে পারে ; পৃথিবীকে নড়ানো যায় না। স্থির-স্থানু এই পৃথিবী, যে আছে মহাবিশ্বের কেন্দ্রে—আর তার মালিক—সৃষ্টিকর্তার রূপে গড়া মানুষ।

এই সময়ে ভিটেনবার্গের প্রটেস্টান্ট ধর্মের প্রচারক মার্টিন লুথারের এক জার্মান ছাত্র, পঁচিশ-বছরের গণিতের অধ্যাপক রেটিকাস (*Rheticas*) কোপার্নিকাসের কাছে এলেন। কোপার্নিকাস তখন ছেষট্টি বছরের বৃদ্ধ। এই যুবা আর বৃদ্ধ দশ সপ্তাহ ধরে নতুন তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে গেলেন। বিস্মিত রেটিকাস সেই আলোচনার উপলব্ধি ভরা একটি পুস্তিকা লিখলেন—প্রথম বিচার : *First account*। এখানে বীজ আকরো কোপর্নিকাসের চিন্তাসূত্র প্রকাশ করলেন। আর তখনই ওঠে উপহাস—নিন্দার ঝড়। প্রোটেস্টান্ট দার্শনিক মেলানক্থন ফতোয়া দিলেন—'এই ধরনের লোকের মনকে সংযত করা জ্ঞানবান শাসকদের অবশ্য কর্তব্য।' অতএব পুস্তক প্রকাশে কোপার্নিকাস আরো পিছিয়ে গেলেন। তবু জেদী, গোঁয়ার জার্মান রেটিকাস বইটা প্রকাশ করতে তাঁকে অনুরোধ-উপরোধ করে চলেন। ত্রিশবছর ধরে যে কাজ তিনি

শুরু করেছেন—কেন তা লোকচোখের অগোচরে থাকবে ? কেন ? এই জানা কি ভুল ? লোকের নিন্দা কি সত্যকে আটকে রাখতে পারে ? টলেমির আলমাগেস্টে ছিল ইজিপ্ট-মেসোপটেমিয়া-গ্রীসের চিন্তার সংকলন। সে কত প্রাচীন। প্রাচীন বলেই সে সত্য হবে ?

বড় অসুস্থ হয়ে পড়েন কোপার্নিকাস। সেই রোগ যন্ত্রণার কালে রেটিকাসকে বললেন, 'বইটা প্রকাশ কর—ওরা আর আমার কিছু করতে পারবে না !' এই বই ছাপা হয়—প্রকাশ হয় ১৫৪৩ সালে। বইটিকে তিনি পোপ তৃতীয় পলের নামে উৎসর্গ করেন। আর বই পড়ে বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে বাইবেলপন্থী প্রোটেস্টান্টরা। তাদের গুরু মার্টিন লুথার কোপার্নিকাস সম্পর্কে লিখলেন—'এই এক জ্যোতিষী এসেছে যে বলছে পৃথিবী অক্ষে আর কক্ষে ঘোরে·····কি সময়ে না আমরা আছি! একটা কিছু নতুন কথা বলে চালাকি চতুরতার প্রকাশের কি সুন্দর আয়োজন; —এরা ভাবে, এদের ভাবনার তুলনা নেই,—সব চিন্তা থেকে শ্রেষ্ঠ। এই মূর্খের দল গোটা জ্যোতির্বিজ্ঞানকে উলটে দিতে এসেছে।'·····

কোপার্নিকাস তখন গতি-বাধা শক্তি রহিত। ছাপানো বই তাঁর বুকে রাখা হলো—তাঁর সম্বিত নেই। ওরা তাকে কেউ কিছু করতে পারলো না ! নিন্দা-অপযশের বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি ! বই প্রকাশের কিছুদিন পরে তিনি মারা যান।

কোপার্নিকাসের তত্ত্বের নতুনত্ব চমক আনে। সূর্যকেন্দ্রিক গ্রহলোকের কথা তিনি বললেন, বললেন গ্রহদের পথ বৃত্তাকার, তবে সূর্য ঠিক বৃত্তদের কেন্দ্রে নেই।—আরিস্তোতল্ পঞ্চান্নটি আকাশবৃত্তের পথে স্বর্গবস্তুর পরিক্রমার পথ গড়েছিলেন ; টলেমি জানিয়েছিলেন আশিটি বৃত্তপথ। আর কোপার্নিকাসের তত্ত্বে পাওয়া গেল চৌত্রিশটি মাত্র। তবু তাঁর পথের মাপজোকে অনেক ত্রুটি; তাঁর পরবর্তী জ্যোতির্বিজ্ঞানবিদ টাইকো ব্রাহের পথ থেকে তাঁর পথের ত্রুটি প্রায় কুড়িগুণ। অন্যদিকে গণিতের ভাষায় তত্ত্বকে বাঁধতে গিয়ে কোপার্নিকাসের অনেক ভুল ধরা পড়ে। অথচ তাঁর তত্ত্বের সরল সাবলীলতা, তাঁর গণিতের সহজিয়া ধারা চিন্তাবিদদের ভাবিয়ে তোলে, যদিও ব্যবহারিক মানুষ এই তত্ত্বকে মেনে নিতে তখনো অক্ষম।

কোপার্নিকাসের চিন্তা মানুষের অহমিকায়-অহঙ্কারে আঘাত হানে। মানুষ শ্রেষ্ঠ নয়, তার এই পৃথিবী—কেন্দ্রবিন্দু নয়। অন্য দিকে সব কিছুর গতি পথের ছাঁচে ধরা পড়ে মহাবিশ্বের বিরাট বিশালতার ছোঁয়া। কোপার্নিকাস বিশাল মহাকাশের কথা ভাবলেন—বললেন, তারাদের পৃথিবী থেকে সর্বত্র প্রায় এক অবস্থানে দেখা যায় তার কারণ এরা অনেক অনেক দূরে আছে। অন্যদিকে সূর্যের চারদিকে গ্রহেরা লাইন পাতা রেলগাড়ির মত আকাশে চলেনা—এখানে নিশ্চয় কোনো ফোর্স কাজ করবে যে ফোর্স তাদের পথ ও গতি নিয়ন্ত্রণ করবে—কারণ স্পেস কঠিন নয়, স্বচ্ছ নয়; কোপার্নিকাসের ধারণা এই ফোর্স মহাকর্ষ—গ্র্যাভিটেশন—যার টানে বস্তু পৃথিবীর কেন্দ্রে পড়ে। তবু সে যে কি —তা তিনি জানেন না।

পুরনো কঠিন সংবদ্ধ ছোট বিশ্বলোক একটি অসীম স্পেসে রূপান্তরিত হলো। এখানে আকাশবস্তুদের আটকে রাখে এক অধরা-অজানা বন্ধন —একটি ফোর্স। এই ফোর্স প্রাকৃতিক—ফিজিক্যাল। এটি দৈবী নয়। মহাবিশ্বলোকের চিন্তায় কোপার্নিকাস নতুন, নমনীয়, সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক ক্রিয়ার কথা ভাবলেন। আর এই ভাবনা সেদিনের চার্চের চিন্তার পরিপন্থী। অন্যদিকে পুরাতন ক্ষুদ্র-বৃহৎ বস্তুর ধারণা, যাকে বলা হতো মাইক্রোকসম আর ম্যাক্রোকসম, যা ছিল সেকালে এবং একালের জ্যোতিষের ভিত্তিভূমি—সেই ধারণায় চিড় দেখা দেয়। মানুষের স্বাস্থ্যে, সৌভাগ্যে, ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপে আকাশবস্তু কি কাজ করে—সেখানে প্রশ্ন জাগে। চিকিৎসাবিজ্ঞান এমনকি প্রাণ বিজ্ঞান নিয়ে নতুন করে চিন্তা শুরু হয়। অন্য এক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূচনা হয়—যা চিকিৎসা বা জ্যোতিষশাস্ত্র থেকে আলাদা। এবং আরম্ভ হয় মানুষ নিয়ে ভাবনা —নৃতাত্ত্বিক গবেষণা। একটি তত্ত্বের আবির্ভাবে চিন্তা জগতে ওলোট-পালোট ঘটে যায়। মার্টিন লুথার ভেবেছিলেন পুরনো জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই বৈপরীত্য মূর্খামো। সত্যিই কি তাই?

১৫৪৩ সালে আরো একটি ঘটনা ঘটে। ভেসালিয়াস (*Vesalius*) প্রকাশ করেন মানুষের শরীরের বুনোট (*Fabric of Human*

Body) নামের গ্রন্থটি। এই গ্রন্থটি আধুনিক শরীর বিজ্ঞানের দিশারী। আর এই ভেসালিয়াস গ্রন্থ প্রকাশের সুবাদে একটি ভাল মাইনের সুখের কাজ হাতিয়ে নিয়ে জীবনে আর বিজ্ঞান চর্চা করলেন না ; সচ্ছলতা তাকে বিজ্ঞানের পথ থেকে সরিয়ে আনে। তবু এনাটমির নতুন যুগের সূচনা এই ১৫৪৩ সালে।

আর ১৫৪৩ সালে টার্টাগলিয়া লাতিন ভাষায় সমগ্র আর্কিমীদিসের রচনার অনুবাদ প্রকাশ করলেন। গণিত ও যুক্তিক্রমের একত্র মেল-বন্ধনের সূচনা এই গ্রীক বিজ্ঞানীর হাতে। লজিকের আরোহী-অবরোহী পদ্ধতির প্রয়োগও তিনি করেন। আর জানালেন, তথ্য থেকে বিজ্ঞানের তত্ত্ব গড়ে তোলার সময় ভাষাগণিত কত সহজে অনায়াসে কাজে আসে। কত সংক্ষেপে সর্বজনীনতা আনা যায়। নতুন পৃথিবীর কাছে আর্কিমী-দিসের পুনরাবির্ভাব ঘটে। জানা গেল একটি মানুষ একটি সময়ে অগ্রগতির সম্পূর্ণ শৃঙ্খলিত ক্রমটি ধরতে পারে না—সম্পূর্ণ মানব সমাজ এখানে অংশ নেয় ; দীর্ঘকালে তার পরিব্যাপ্তি। আর যা চিরন্তন সত্য, যা মানবসত্য, মৌলিক মূল্য বোধ,—তার লয়ক্ষয় বা পরিবর্তন নেই। সে অবিনশ্বর।

১৫৪৩ সালে রেনাসাঁসে জগৎ জানলো সমাজের ধর্ম বিজ্ঞানের নৈতিক মানের উপর নির্ভর করে। বিজ্ঞান শুধু সামাজিক নয়, বিজ্ঞান সমাজের কারুশিল্পী।

ভোরাই গান

১৫৪৩ সালকে রেনাসাঁস যুগের একটি ক্রান্তিবিন্দু বলতে পারি—যেমন বলা যায় ১৪৯২ সালকে—যেদিন নতুন পৃথিবীর আবিষ্কার ঘটে কলম্বা-সের হাতে। গণিতের চিন্তা, তার চিহ্ন সব কিছু শুরু হয় ১৫৪৩ সালের পর থেকে যার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৫৯৪ সালে—কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের একশ বছরের কিছু পরে ব্যারন জন নেপিয়ারের লগারিথম আবিষ্কারে। গুণ ভাগ করা সহজ হলো। লগারিথমের উন্নতি ঘটান

ব্রিগস। আর এরই সূত্র ধরে ১৬২২ সালে পাওয়া গেল স্লাইডরুল।

তবে এযুগের সবার বড় আবিষ্কার হলো ১৫৪০ সালে যার জন্ম সেই উইলিয়াম গিলবার্টের হাতে। তিনি জানালেন, এ পৃথিবী যেন চুম্বক, যার চুম্বক মেরু আর পৃথিবী উত্তর-দক্ষিণ মেরুতে তফাত আছে। চুম্বক ধর্ম যে দূর থেকে কাজ করে, তার প্রমান দিলেন। আর যে সব পদার্থ বিদ্যুতায়িত হয়, তাদের বললেন ইলেকট্রিক। ইলেকট্রিসিটি শব্দটি তার হাত থেকে পাওয়া গেল। ১৬০০ সালে গিলবার্ট একটি বই প্রকাশ করেন—'চুম্বক ও চুম্বক বস্তু বিষয়ক'—*On magnet and magnetic Bodies* ; এই বইয়ের আলোচনায় তিনি দূর থেকে ভেসে আসা চুম্বক আর বিদ্যুৎ ধর্মের বিচার করতে গিয়ে ভাবেন দূর বিশ্বে গ্রহনক্ষত্র বন্ধনের ক্ষেত্রে হয়তো এ জাতীয় ফোর্স কাজ করে। আরিস্তোত্‌লের বিশ্বের আকাশবস্তুকে স্থূল ইথারের টান ধরে রেখে দিত। এই বিশ্ব-গোলক ইথারে ভরা ছিল। গিলবার্ট কোন স্থূল আকৃতির কথা ভাবলেন না ; ভাবলেন এক বিমূর্ত, অদৃশ্য ফোর্সের উপস্থিতি। গ্রীক চিন্তা নিয়ে দ্বিতীয় জন সংশয় তোলেন।

তৃতীয় সংশয়ী হলেন ডাচ—সাইমন স্তেভিন। জন্ম ১৫৪৮ সালে আণ্টওয়ার্পে। কাস্টমসের কেরাণী থেকে হলেন অঙ্কের মাস্টার—ছাত্র হলো লেইডেনের হবু ইঞ্জিনিয়ারের দল। স্তেভিন প্রথমে প্রকাশ করেন সুদকষার কটি চটজলদি নিয়ম।—বন্ধুরা এই প্রকাশে বাধা দিতে চায়। বলে,নিয়ম জানলে তাঁর কাছে লোকে আসবে কেন? স্তেভিনের উত্তর—বিজ্ঞানের নিয়ম কারো একার সম্পত্তি নয়।…দশমিক প্রথা তিনি শুধু যে প্রবর্তন করেন তা নয়, উন্নতিও ঘটান। ১৫৮৫ সালে তাঁর বইয়ের উৎসর্গ পত্রে লিখলেন 'জ্যোতির্বিদ, জরিপকার, দর্জি,দোকানী, টাইপের ছাঁচ যারা করেন এবং সমস্ত বণিকদের উদ্দেশ্য—সাইমন স্তেভিন এঁদের সু-স্বাস্থ্য কামনা করেন।'—স্তেভিন জানালেন, গণিতের ব্যবহার মুষ্টিমেয়ের হাতে আর থাকছে না—গণিত বিরাট স্প্রেকট্রামে ছড়িয়ে পড়তে চলেছে। পাটিগণিতের ধারণায় শূন্যের স্থান তিনি ঠিক করলেন ;

সংখ্যার শুরু শূন্য থেকে—যে শূন্য যেন জ্যামিতির বিন্দু—তার দুদিকে রাশি থাকতে পারে। জানালেন বর্গমূলকে রেখার পথে জ্যামিতির ছকে অঁাকা যায়—যেমনটি পিথাগোরানরা করেছিল—আবার কষা যায় দশমিকের প্রণালীতে, পাটিগণিতের নিয়মে। এলজেব্রার যে লজিক বা যুক্তি নির্ভরতা—তাঁর সুষ্ঠু প্রকাশ তার হাতে।

মেকানিকস নিয়ে ভাবলেন স্তেভিন। হাইড্রোস্টেটিকস নিয়ে ভাবনা হলো বেশি—কারণ সেদিন হল্যাণ্ড সমুদ্রের নিচের জমি উদ্ধারে নেমেছে। আর্কিমীদিসের স্ট্যাটিক্স আর হাইড্রোলিক্স শুধু যে তিনি রপ্ত করলেন তা নয়, তার পরিব্যাপ্তি ঘটালেন। আর প্যারালালোগ্রাম অফ ফোর্সের নিয়মটি বের করে ফেললেন। আশ্চর্য স্তেভিন নিয়ম জেনে যে বই লিখলেন তার নাম *Wonder en is gheen Wonder*—সব ম্যাজিক শুধু ম্যাজিক নয়। বই লিখলেন মাতৃভাষায়—ডাচে। আর হাইড্রোস্টেটিক্সের নিয়ম থেকে জানালেন জলে ভাসা কোনো বস্তুর নিচে জল যে চাপ দেয়, তা তার ওজনের চেয়ে বেশি হতে পারে। কাজেই জাহাজটিকে সুস্থিত করতে হলে তার সেণ্টার অব গ্র্যাভিটি কম হলেই চলবে না,—সরানো জলের ধারার নিচে তাকে থাকতে হবে।

আর সবার শেষে তিনি উঁচু থেকে দুটি পদার্থ ফেলে গালিলিওর আগেই জানলেন, সব পদার্থ উঁচু থেকে নামার সময় একগতিতে একসঙ্গে নামে। শুধু একবার একটা গোলমাল পেলেন—রেশমে গড়া একটা বল এক টুকরো রেশম থেকে আগে নেমে এল! আরিস্তোতলের তত্ত্বটিকে ভাঙতে চেয়ে ভাঙতে পারলেন না তিনি। তাছাড়া ডাচ ভাষায় লেখার খোঁজখবর কেইবা তখন রাখে। তবু গ্রীক চিন্তায় সংশয় তোলেন স্তেভিন। শুধু আর্কিমীদিস ভাল ভাবে তার কাছে পরীক্ষায় পাশ করে যান।

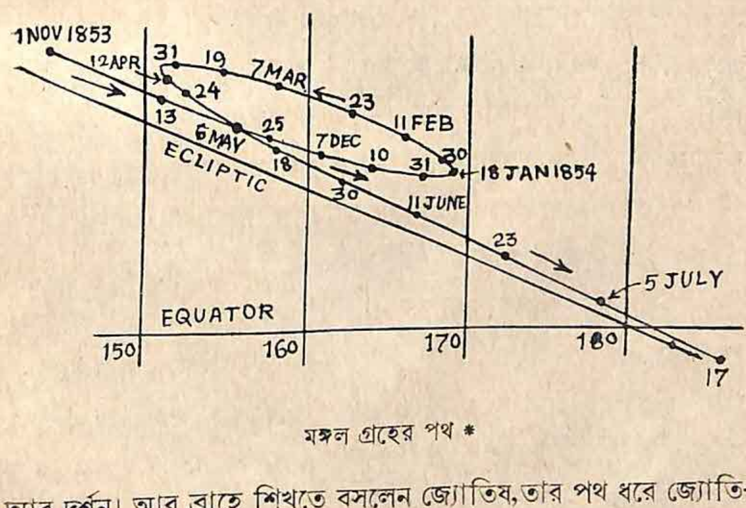
রেনাসাঁসের কালে সাদা মনে যুক্তি বিচারে পরীক্ষায় নেমেও সংশয়ী স্তেভিন মাঘের শেষে সকৌতুকে যাদের আসার কথা তাদের পথটুকু গড়ে তুললেন—আর একটি কথা সদর্পে জানালেন—বিজ্ঞান সর্বজনের; গণিতের আগ্রাসী অভিযানকে থামানো যাবে না।

ইতিমধ্যে সংশয় সংকটকালে ডেনমার্কে হ্যামলেটের আবির্ভাব হলো

—বিজ্ঞান জগতের হ্যামলেট—কি হবে আর কি হবে না সেই হিসেবের ভাবনাতে যিনি খাতা ভরে তুললেন—সংশয়ের সমাধান পেলেন না—সেই হ্যামলেট হলেন টাইকো ব্রাহে।

সংশয়ের দোলা

ইলসোনরের রাজপ্রাসাদে ডেনমার্কের যুবরাজ তাঁর জীবনের ট্রাজেডি অভিনয় করে গেলেন। ইলসোনরের নদীর অপর তীরে হেলসিনবর্গে ১৫৪৬ সালে টাইকো ব্রাহের জন্ম। হেলসিনবর্গ ক্যাসেলের গভর্নর ছিলেন তাঁর বাবা। ছেলেকে আদর করে ডাকতেন টাইগ (*Tyge*)। বারোবছর বয়সে ছেলেকে কোপেনহাগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা নিতে পাঠালেন। মাস্টাররা চাইলেন সে শিখুক ছন্দশাস্ত্র



মঙ্গল গ্রহের পথ *

আর দর্শন। আর ব্রাহে শিখতে বসলেন জ্যোতিষ, তার পথ ধরে জ্যোতির্বিদ্যা।...হোরাশিও, দর্শনের বাইরেও যে অনেক কিছু থাকে!......

*[সালটি ১৫৫৩-১৫৫৪ হবে, ১৮৫৩-৫৪ নয়। ভুলের জন্য দুঃখিত।]

তেরবছর বয়সে কোপেনহাগেনে আংশিক সূর্যগ্রহণ ঘটে—আর সেই গ্রহণ দেখে তাঁর জ্যোতির্বিদ্যা শেখার আগ্রহ আরো বেড়ে যায়।

তিনবছর গণিত আর জ্যোতির্বিদ্যা শেখার পর এলেন আরো উচ্চ শিক্ষার জন্য লাইপজিগে। এখানে বাইরে তিনি আইনের ছাত্র, আর ভিতরে ভিতরে বিজ্ঞানের পুঁথিপত্র যন্ত্র হাতিয়ার কিনে বেআইনি ভাবে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করে চলেছেন! গ্রহদের পথের একটা পুরনো সারণী কেমন করে জানি হাতে জুটে গেল—আর তা নিয়ে চর্চা করতে গিয়ে দেখেন সেই সারণী কত ভুলে ভরা! কেন এত ভুল? টাইকো ভাবেন বোধহয় প্রাচীনরা আকাশবস্তুদের একটানা অনেকদিন ধরে ভাল করে দেখেনি তাই উলটোপালটা পথের নিশানা আঁকা! আর তখনই ঠিক করে বসেন, ঠিক ঠাক আকাশবস্তু দেখার কাজটা তিনি করবেন।...উঠল বাই তো কটক যাই—সব কাজ ফেলে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চায় তিনি মেতে উঠলেন। ১৫৬৩ সালে আকাশে বৃহস্পতি আর শনির একত্র সম্মেলন ঘটে। অথচ প্রাচীন পুঁথিতে হিসেব কষে যেদিনে এই সম্মেলন হবার কথা সেদিনে তা ঘটেনা! নানা মতে মিল নেই। দিনে ভুল কোন মতে কয়েক দিন, কোথাও বা মাসে।

জাহাজীদের দূরবীনে যেমন আড়কাঠি থাকে সে ধরনের যন্ত্র নিয়ে তিনি দুটি গ্রহকে মাপতে বসেন।—তবু দেখেন যন্ত্রে ভুল—মাপে ভুল। কত ভুল? টাইকো ভুলের পরিমাণটাও মাপতে থাকেন যাতে ভবিষ্যতে নির্ভুল হিসেব কষা যায়। তিনি যা সেদিন পারলেন না, অন্যের হাতে তা সুষ্ঠু হয়ে সেজে দাঁড়াক। এই ১৫৬৪ সালে টাইকো বিজ্ঞান সম্মত দেখার রীতিটি প্রতিষ্ঠা করলেন—জন্ম হলো আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার। কেপলের এই বছরটিকে নির্দেশ করে বললেন, 'ফিনিক্সের জন্ম হলো'—ফিনিক্স হলো টাইকো! টলেমির পর পুনর্জন্মের জন্য জ্যোতির্বিদ্যা আত্মাহুতি দিয়েছিল—এতদিন পর আগুন থেকে বেরিয়ে এল নতুন পাখি ফিনিক্স! আর সেই শনি-বৃহস্পতির রহস্যময় কালে ডেনমার্কের যুবরাজ হ্যামলেটের লেখক শেক্সপিয়ারের জন্ম হলো—ফিনিক্সের জন্মের বছর—১৫৬৪ সালে!

টাইকো লাইপজিগ ছেড়ে গেলেন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ভিটেনবার্গে—যেখানে স্বয়ং হ্যামলেট এসেছিলেন। এখানে পরিচিত হলেন রোজেনক্রান্ৎস (*Rosencrantz*) আর গিল্ডেনস্টার্ন পরিবারের সঙ্গে—যেমনটি ঘটেছিল হ্যামলেটের জীবনে। শুধু টাইকোর বেলা এঁরা তাঁর দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। ভিটেনবার্গ সে যুগে জ্যোতিষ, জ্যোতির্বিদ্যা আর গণিতের পীঠস্থান—তাই গ্যেটের ফাউস্টও এখানে পড়তে এসেছিলেন। এখানে পড়া শেষ করে জ্যোতিষ আর এলকেমিতে বিশদ শিক্ষা নিতে টাইকো এলেন রোস্তোক। এখানে একটি দ্বন্দ্ব যুদ্ধে ডুয়েলে নেমে নাকের ডগাটুকু খোয়ালেন। আর তারপর সারাজীবন সোনারুপোয় গড়া এক টুকরো দিয়ে নাকটিকে মেরামত করে নিলেন। বিখ্যাত ফরাসী নাটক সিজারো যেমন নাকের জন্য বিখ্যাত ছিলেন, সেই খ্যাতি বা অখ্যাতি জোটে টাইকোর। ডুয়েলের পর আর বেশি বিদেশে থাকলেন না, ফিরে এলেন ডেনমার্কে। জ্যোতির্বিদ্যায় উচ্চতর গবেষণার জন্য ডেনমার্কের রাজা তাঁকে মুক্তহস্তে সাহায্য করলেন। এইবার তিনি আরেকবার বিদেশে গেলেন—ইনস্ট্রুমেন্ট-যন্ত্রের কেন্দ্র অগসবর্গে। এইখানে নিজের মনের মত, পছন্দসই যন্ত্র তৈরি করালেন, কিনলেন। বড় ছোট নানা যন্ত্র নিয়ে ডেনমার্কে ফিরে এসে বীক্ষণাগার তৈরি করার কালে শুরু করলেন এলকেমির চর্চা—কারণ জ্যোতিষ আর এলকেমি তখন একসঙ্গে চলতে ফিরতে লেগেছে। লোকে জানতো মঙ্গল কুপিত হলে লোহা ধারণ দরকার, আর শুক্র গ্রহকে জব্দ করতে পারে পারদ—কারণ পারদ আর শুক্র হলো মার্কারি।

এমনিই চলছিল। তারপর হঠাৎ ১৫৭২ সালে নভেম্বরের আকাশে এক নতুন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক দেখেন—ক্যাসিওপিয়া নক্ষত্রপুঞ্জে হঠাৎ তার আবির্ভাব। একি স্বপ্ন না মায়া! জনে জনে জিজ্ঞেস করেন টাইকো—দেখেছ, ঐ উজ্জ্বল আলো দেখেছ?—সকলেই দেখে। তারা দেখে বিস্ময়ে। আর টাইকো সেই তারা নিয়ে দিনরাত পরে থাকেন। কয়েক মাস কেটে যায়; সেই জ্যোতিষ্ক তারার মত মিটমিট করতে করতে ধীরে

ধীরে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে থাকে—দিনের আলোতেও তাকে দেখা যায় ; তারপর আবার উজ্জ্বলতা হারাতে হারাতে টিমটিম করে দেড় বছরে হারিয়ে যায়। তার আলোর রঙ সাদা থেকে হলুদ হয়ে শেষে লাল হয়ে দাঁড়ায়।

এও এক তারা—যে তারা আকাশে প্রোথিত, অথচ এর ইতিবৃত্ত আরিস্তোত্‌লের-টলেমির পঞ্জিকায় নেই। নতুন তারার আবির্ভাবে আরিস্তোত্‌লের ফিক্সড্ স্টার তত্ত্ব বেদম হয়ে ওঠে। নতুন তারাকে টাইকো বললেন নোভা—আর এই নোভা গ্রীকতত্ত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। সে যুগে এই তারা যে আলোড়ন জাগিয়েছিল সেই নোভা বা স্থপার নোভা আজও স্মৃতি ছড়িয়ে রেখেছে মহাকাশে ; ক্যাসিওপিয়া নক্ষত্রপুঞ্জে এই তারা বিস্ফোরণে ফেটে গিয়ে যে ছাইপাঁশ ফেলে গেছে তার চিহ্ন রেডিও রশ্মিতে ধরা যায়। নতুন তারা বিজ্ঞানে এক নতুন দিগন্তের স্থচনা করে।

নিজের আর পরিচিত কয়েক জনের জন্য টাইকো তাঁর দেখার ইতিবৃত্ত লিখে রাখেন ; ছাপেন না। অন্যদিকে এদিক সেদিক থেকে এই তারা নিয়ে বহু লেখা বেড়ায়—তারা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি উদ্ভট। অবশেষে সাতাশ বছর বয়সে ১৫৭৩ সালে টাইকো তাঁর কাজের ইতিহাস ছাপান। জানা গেল নতুন-পুরনো ধারণার মধ্যে অনেক ফাঁকি আছে। মহাকাশে এমন অনেক কিছু আছে যার খবর জানা নেই, অনেক প্রশ্ন তোলা যায়। জানা গেল, ঠিকই। তবে সেই প্রশ্ন নিয়ে মহাকাশ গবেষণায় বৈজ্ঞানিক রীতিতে কাজে নামলেন শুধু একজন—তিনি টাইকো ব্রাহে।

এদিকে জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছে—কোপেনহাগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদে আমন্ত্রণ পান। বড় লোকের সন্তান টাইকোর কাছে অধ্যাপকের পদটি ঠিক সম্মানজনক মানানসই ঠেকেনা। তবু অনুরোধেউপরোধে রাজি হয়ে যান। তবে একটি শুধু শর্ত, বক্তৃতা দেবেন ডেনিশ ভাষায়, কারণ গ্রীকরা নিজের ভাষায় জ্ঞান চর্চা করেছিল বলে তারা জ্যামিতি বিজ্ঞানে এত উন্নতি করেছিল। মাতৃভাষাতেই

বিজ্ঞান চর্চার শুরু হওয়া দরকার। এই বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিটি কিন্তু আবার ভাবেন সময় অবস্থানের ছকে যেমন জ্যোতির্বিদ্যা গড়ে উঠবে, তেমনি জ্যোতিষও উপস্থিত হবে। একমাত্র নিরীশ্বররা জ্যোতিষকে তুচ্ছ করতে পারে। অন্য বস্তুকে বিশ্বের সব বস্তু প্রভাবিত করে—মানুষের ভাগ্যকেও নিয়ন্ত্রণ করবে এই অন্তর্ক্রিয়া। জ্যোতির্বিদ্যা যত জানা যাবে, জ্যোতিষ তত সুস্পষ্ট হবে।

রাজকীয় অনুমোদনে-বদান্যে টাইকো হ্বীন (*Hveen*) নদীর ধারে ইলসোনরের কাছে এক দ্বীপে এক বিরাট বিশাল অবজার্ভেটারি তৈরি করলেন—নাম দিলেন য়ুরোনিবর্গ (*Uroniborg*) যার মানে স্বর্গনগরী। এইখানে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম যন্ত্র আনলেন, তাদের রাখলেন মাটির নিচে—যাতে আবহাওয়ার পরিবর্তনে যন্ত্রে কোনো তারতম্য না ঘটে। এইখানে একেকটি তারা-গ্রহ ধরে নিরীক্ষা চলে—দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখা হয় অবস্থান, পরিবর্তন। স্বর্গনগরীর পাশে আরো একটা বীক্ষণাগার তৈরি হলো শুধু তারা দেখার জন্য—নাম হলো স্তিয়ার্নিবর্গ (*Stjerneborg*)—নক্ষত্র নগরী। গ্রহ-নক্ষত্র প্রতিটির দৈনন্দিন অবস্থানিক স্থান একাগ্রচিত্তে লিখে গেলেন, ভুলভ্রান্তি কোথায় ঘটতে পারে তার চিন্তা করলেন—আর সব মিলিয়ে ঠিক করলেন শুদ্ধ অবস্থান। একেকটি গ্রহের যাত্রা পথের ম্যাপ এঁকে গেলেন; পূর্বসূরীদের মত এখানে দেখা আর কল্পনা একত্রে মিশল না।—আর সেই ম্যাপ দেখে তাঁর মনে হলো গ্রহের পথ বৃত্তাকার নয়—ডিম্বাকার, ওভাল।

টাইকো তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী নন। গণিত তিনি জানতেন, তা ট্রিগনোমেট্রি, যার সাহায্যে গ্রহনক্ষত্রের কালিক অবস্থান অন্য কারো সাপেক্ষে মাপা যেত। কিন্তু মৌলিক চিন্তাপদ্ধতির জন্য গণিতকে ব্যবহার করতে জানতেন না। গণিত তাঁর হাতিয়ার, ভাষা নয়। তিনি দেখলেন; সে দেখা চোখে দেখা, বারবার দেখা! দেখাকে চোখের বাইরে আনতে পারলেন না। তাই তথ্য তিনি জোগাড় করলেন, তার মালা গাঁথাতে যে কুশলতা থাকে তা তিনি পারলেন না। জ্যোতির্বিজ্ঞানের উদ্যানের মালঞ্চের ফুল ফোটানোর কাজেই ব্রতী হয়ে রইলেন।

১৫৭৭ সালে ইউরোপের আকাশে এক ধূমকেতু দেখা দেয়। আর তার অনুপুঙ্খ যাত্রা পথ, আচার ব্যবহার দেখে যান টাইকো। তিনি জানলেন এই আকাশবস্তু পৃথিবী থেকে আছে অনেক দূরে, এটি আবহাওয়ার কীর্তি নয় যেমনটি ভেবেছিলেন আরিস্তোত্‌লের অনুগামীরা। এই ধূমকেতু আর সুপার নোভা একটা সংশয় জানায়—টলেমির জানানো মহাকাশ কি সম্পূর্ণ? তবে কি কোপার্নিকাস ঠিক? হ্যামলেটের মতো টাইকোকে একটি সংশয় দিন রাত অসহ্য যন্ত্রণায় দগ্ধ করতে থাকে—*To accept or not to accept Copernicus*—কোপার্নিকাসকে মানা হবে, না মানা হবে না? কোপার্নিকাসের তত্ত্বের গাণিতিক পদ্ধতি নিঃসন্দেহে সঠিক; কিন্তু এতদিনের ঐতিহ্য, প্রাকৃতিক অনুশাসন সে যে ভেঙে যায়! তাছাড়া বাইবেলের জেনেসিসের রীতি খাটে না। সবার উপর মাটি পাথর ভরা এত বড় পৃথিবী কি করে ঘোরে?···সব মিলিয়ে তিনি এক কম্প্রোমাইজ ফর্মুলা বা সমঝোতায় নামেন। সব গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে। পৃথিবী শুধু স্থির, তাকে ঘিরে ঘোরে সৌরলোক, চাঁদ আর তারকারা। মোটামুটি নতুন পুরনো মতের একটা সমন্বয় করা যায়। তবে গ্রহের পথ বৃত্তাকার নয়। ওভাল।

ইতিমধ্যে টাইকোর পৃষ্ঠপোষক রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডরিখের মৃত্যু হয়। নতুন রাজা টাইকোর গবেষণাগারের বৃত্তি কমিয়ে দেন। টাইকো নিজেকে অপমানিত মনে করেন। নতুন জায়গায় যাবার চেষ্টা করেন। নিজের ও তাঁর কাজ সম্বন্ধে একটি অনবদ্য বায়োডেটা তৈরি করে ইউরোপের বিভিন্ন রাজসভায় পাঠিয়ে দেন। আর ডাক আসে প্রাহা থেকে, রাজা দ্বিতীয় রুডলফ তাঁকে রাজকীয় গণিতজ্ঞের সম্মানিত পদে আহ্বান করেছেন। তাঁর যন্ত্রপাতি নিয়ে টাইকো চলে আসুন—যা খরচ লাগে তা বহন করবে প্রাহার রাজকীয় ভাণ্ডার।

১৫৯৯ সালে রাজকীয় গণিতজ্ঞ প্রাহায় এলেন, তাঁর বীক্ষণাগার তৈরিও করলেন। আর সহকারী হয়ে ডেকে পাঠালেন জার্মানির বিখ্যাত গণিতবিদ কেপলেরকে! ১৬০০ সালে কেপলের এলেন, তখন তার বয়স আঠাশ, ব্রাহের বয়স চুয়ান্ন। কেপলেরের হাতে তাঁর তথ্যসম্ভার দিয়ে

যান ব্রাহে। বলেন, মনে হয় কোপার্নিকাস ঠিক। তবু মানতে মন চায় না। এদিকে হঠাৎ স্বাস্থ্য ভেঙে যায়; মৃত্যু শয্যায় কেপলেরকে বলেন, পারতো সারণী গুলো শেষ করো; দেখ কোপার্নিকাসকে এড়িয়ে পুরনো মতে কিছু করা যায় কিনা। আর দেখ গ্রহের পথ বৃত্তাকার নয়। মনে হয় ডিম্বাকার। সেই প্রমাণও তোমার হাতে!

এবার টাইকো ব্রাহে মারা যান ১৬০১ সালে। সংশয়ের নিরশন হয় না। হ্যামলেট মারা গেলেন, তবু দ্বিধাদোলায়মান সংশয় দীর্ণ মনটি শান্ত হতে পারলো না।······হোরাশিও—অনেক কিছু অজানা থেকে যায়, যার উত্তর নেই দর্শনে অথবা চোখের দেখায়। আবার যে উত্তরকে সঠিক মনে হয়, তাকে মন যে মেনে নিতে চায় না!······

পুরনোর বাঁধন কাটা সে বড় দুঃসহ, সে যে বড় যন্ত্রণার, হোরাশিও!—সে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি কি আনতে পারবে—কেপলের?

বাঁধন ছেঁড়ার প্রচেষ্টায়

অন্য এক যন্ত্রণা নিয়ে কেপলেরের শৈশব শুরু। ১৫৭১ সালের সাতাশে ডিসেম্বর এক পেশাদার যোদ্ধা আর সরাইখানার মেয়ের ঘরে কেপলের জন্ম। জন্ম থেকে রুগ্ন, চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ; কাজেই আকাশ দেখা তাঁর আর হয়ে ওঠেনা! তাঁর মা গাছ-গাছরার ওষুদ বিষুদ তাবিজ মাদুলি দিতো, জ্যোতিষ আর ম্যাজিকের চর্চা করতো। ফলে ডাইনি হিসেবে বদনাম রটে, পুড়িয়ে ফেলার হুকুম জারি হয়। ছোট কেপলের ছয় বছর ধরে আইনের লড়াই করে হুকুম মকুব করেন; আর সেই সুবাদে বিখ্যাত



কেপলের

হয়ে যান। মায়ের জ্যোতিষ চর্চার ধারা উত্তরাধিকার সূত্রে কেপলেরও পান, আর সেই পথে জ্যোতির্বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকে পড়েন। বাবা যে কোথায় পয়সা নিয়ে লড়াই করে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার খোঁজ পাওয়া যায় না। কাজেই দাদু-দিদিমার কাছে রয়ে গেলেন তিনি। তারা চান শিল্পকর্ম শিখুক নাতি—এতে বেশ রোজগার আছে। কেপলেরের অন্য ইচ্ছা। ইচ্ছা বিদ্বান হবেন, জ্ঞানী হবেন। একটা সুযোগও জুটে গেল। সে যুগে ক্যাথলিকদের প্রতিদ্বন্দ্বী অনেক ভাল ভাল স্কুল প্রোটেস্টাণ্টরা জার্মানিতে স্থাপন করেছিল। সাত বছরে এরকমের একটা স্কুলে এড-মিশন পান। আর পরে পরীক্ষা দিয়ে প্রোটেস্টাণ্ট যাজক হবার জন্য উচ্চতর শিক্ষায় বৃত্তি পান। তুবিনগেন (*Tubingen*) বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের স্নাতক হলেন। আর এখানে সে যুগের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী মাসট্লিন (*Mastlin*) এর বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য হল। মাসট্লিন ক্লাসে পড়াতেন পুরনোধারায় জ্যোতির্বিজ্ঞান, আরিস্তোত্ল্ আর টলেমি, আর আড়ালে বাছাই ছেলেদের শেখাতেন কোপার্নিকাসের তত্ত্ব।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পড়তে কেপলের মহাবিশ্বের সুষমা নিয়ে ভাবেন —প্লাতোর মত সব কিছুতে সুর খুঁজে পান—গ্রহদের অবস্থানের দূরত্বে আছে নির্দিষ্টতা, অনুপাত। সে যেন পিথাগোরাসের সুরের ছক। একটা বই লিখলেন হার্মোনি অফ দি ওয়ার্ল্ড'—বিশ্বের সুর সঙ্গতি। আর সেই সুর যে কি হতে পারে তা একটা স্বরলিপিতে লিখলেন !

যে বছর ব্যারন নেপিয়ার লগারিথম আবিষ্কার করেন, সে বছরে ১৫৯৪ সালে প্রোটেস্টাণ্ট কলেজ গ্রাৎসে (*Graz*) তিনি গণিতের অধ্যাপকত্ব পান—বয়স তখন তাঁর তেইশ। গণিত ছাড়া আরো একটি অতিরিক্ত কাজ তাঁকে করতে হতো, পদাধিকার বলে তিনি হলেন আঞ্চলিক জ্যোতিষী। সারাজীবন কেপলের এই জ্যোতিষী পেশায় রোজগার যা করলেন, তা শিক্ষকতা করে কোনদিন জোটাতে পারলেন না। জ্যোতিষ নিয়ে যত চর্চা করেন তত তাঁর মনে হয় এই বিষয়টি আদি অন্ত গোঁজা-মিলে ভরা। অথচ পয়সা আসে, অর্থ উপার্জনের বিকল্প পথও নেই। এক সময়ে বললেন,জ্যোতির্বিজ্ঞানের নষ্টা কন্যাটি হলো জ্যোতিষ যার রোজ-

গারে মায়ের আর্থিক সচ্ছলতা থাকে ! নষ্টা মেয়ের টাকা নিতে দ্বিধাটুকু ঝেড়ে ফেলতে হচ্ছে—তিনি নিরুপায়। কারণ জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন সেই অতিরিক্ত অর্থ শিক্ষকতা থেকে পান না। তাছাড়া তিনি দুর্বল স্বাস্থ্য, ক্ষীণদৃষ্টির মানুষ। শুধু বেঁচে থাকার জন্য মা যেমন মেয়ের অশালীন পথে রোজগারের টাকা হাত পেতে নেয়, সেই গ্লানি কেপলেরের। গালিবের মত বললেন এ হলো গম্ এ রোজগার—পেশার গ্লানি ! গ্লানিটিকে বিবেকের কোঠা থেকে সরিয়ে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা করেন। আর এই সময়ে তিনি কোপার্নিকাসের তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। অন্য দিকে জ্যোতিষের ভাবনা, রহস্যময়তা সব মিলিয়ে সঠিক বিজ্ঞান ধারণাটি তার ফলে প্রকাশ পায় না। তিনি গ্রীকদের পাঁচটি মৌলিক জ্যামিতি আকারের কথা ভাবেন। দেখেন শনির কক্ষের ভিতর যদি কিউব বসানো যায় তবে জুপিটারের কক্ষ তার চার পাশ ছুঁয়ে থাকে। টেট্রাহেড্রনকে যদি জুপিটারের কক্ষের ভিতর রাখা হয় তবে মঙ্গল গ্রহের কক্ষ তার মধ্যে ধরা পড়ে। এ কি বিস্ময়—কি আশ্চর্য ! কেপলের একটি বই লিখলেন—মিস্ট্রি অফ ইউনিভার্স, বিশ্বলোকের রহস্য। এই বই পাঠান টাইকো ব্রাহেকে, গালিলিওকে এবং অন্যান্যদের কাছেও। টাইকো বই পড়ে বিস্মিত ; অথচ গালিলিও সাদামাটা প্রশংসা করলেন ; শুধু বললেন কোপার্নিকাসের তত্ত্ব যে মানা হলো এটাই আসল। বাকি যা বলা হলো প্রাতিপাত্তিক উপপত্তি হিসেবে সেখানে রহস্যময়তা ছাড়া বিজ্ঞান নেই, যুক্তি নেই।—গালিলিও স্বচ্ছ মনে কেপলেরের প্রতিভার স্ফুরণ ধরা পড়ে। তবে সে যে বড় আগোছাল, বড় এলোমেলো !

এই এলোমেলোমি, রহস্যের প্রতি টান আরো কিছু দিন চলে। কেপলের জানান ঈশ্বরের মনের মাধুরী মিশে জ্যামিতির সৃষ্টি। সৌরলোকের গ্রহদের দূরত্বের অনুপাতে যে ছন্দ ধরা পড়ে—সে একই ছন্দে মহাবিশ্বের কাঠামো তৈরি করেছেন ঈশ্বর। জ্যামিতির স্ফিয়ার—সে হলো পবিত্র ত্রয়ীর (*Holy Trinity*) দ্যোতক। কেন্দ্র হলো ঈশ্বর, আকার জানায় ঈশ্বরের সন্তানকে, আর ভল্যুম জানায় হোলি ঘোস্ট।

মহাবিশ্বে যাত্রার স্বপ্ন দেখলেন তিনি আর জাগে সায়েন্স ফিকশানের স্থষ্টির ভাবনা।—কেপলের সেদিন যেন গ্রীক আরিস্তোত্‌ল্—যিনি বিজ্ঞান অধিজ্ঞান—ফিজিক্স আর মেটাফিজিক্সের দোলনায় দুলছেন; অপূর্ব কবিত্বময় ভাষার বক্তব্য প্রকাশ করছেন,—যা বলছেন তা অস্পষ্ট; অথচ কত সুন্দর মনোহর সেই বাগভঙ্গী।

এদিকে গ্রাৎসে ক্যাথলিকরা প্রবল হয়ে ওঠে—কেপলেরের সেখানে থাকা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। বেসামাল অবস্থা থেকে সরে যেতে চেয়ে টাইকো ব্রাহের আমন্ত্রণ নিয়ে তিনি প্রাহায় কাজে যোগ দেন। টাইকোর জানা তথ্যের সম্ভারে তিনি মুগ্ধ। তবে টাইকোর কোপার্নিকাস সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিরোধী মতামতের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাঁধে। বছর দুয়েক প্রাহায় থেকে গ্রাৎসে আবার চলে এলেন। এবার ক্যাথলিক দলের সঙ্গে একটা কম্প্রোমাইজ করার চেষ্টা করেন। যে কাজ করবেন তার একটা ছক জানালেন;—বললেন, তিনি জানাবেন চাঁদের গতি সমান ইউনিফর্ম নয়, পৃথিবীর টানের জন্য চাঁদের গতির হেরফের ঘটে। পৃথিবী থেকে যতদূরে চাঁদ যায়, তত তার গতি কমে।—এই হলো তার গবেষণার বিষয়। এই গবেষণার আরম্ভে কেপলের প্রাকৃতিক ফোর্সের চিন্তা করলেন। সৌর জগতেও একটা টান থাকবে—। প্রাচীন তত্ত্বে বলা হতো এই টান হলো সংখ্যাভিত্তিক, জ্যামিতির ছকে গড়া। কেপলের দেখেন সংখ্যা-জ্যামিতি এরা গতি বিজ্ঞান বা কাইনেমেটিকের হাতিয়ার—এরা মূল নয়। মূলে কোনো ফোর্স আছে—সংখ্যা-জ্যামিতি সেই ফোর্সের রীতি নীতি প্রকাশ করে। এরা হাতিয়ার বা প্রকাশের ভাষা হতে পারে, আড়ালে থাকে বোধিমনন কল্পনা—আর স্থষ্টির আকাঙ্ক্ষার মত কোনো এক ফোর্স।

ক্যাথলিকদের সঙ্গে তবু বনিবনা হলো না। ইতিমধ্যে টাইকো ব্রাহে মারা গেছেন। রাজা রুডলফ রাজকীয় গণিতজ্ঞের পদে তাঁকে ডাক দিলেন। ক্যাথলিক রাজনীতির চেয়ে রাজা জ্যোতিষ এলকেমি পছন্দ করেন—যে কাজে কেপলেরের আপত্তি নেই, ওতে পয়সা আসে। ১৬১২ সাল পর্যন্ত কেপলের প্রাহায় রইলেন। রুডলফের মৃত্যুর পর চলে গেলেন লিনৎসে (*Linz*)।

মঙ্গল গ্রহের বিচিত্র পথ পরিক্রমার অনুপুঙ্খ ছক নানা নিরীক্ষার পথে টাইকো এঁকে দিয়েছিলেন। ১৫৭০ সাল থেকে ১৫৮৫ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ সাধনায় সে পথ আঁকা। পৃথিবীর গতির সঙ্গে এই পথের মিল টানা কিছুটা অসম্ভব ছিল। কোপার্নিকাসের মতানুযায়ী পৃথিবীর গতি যদি জানা যায় তবে তার সাপেক্ষে মঙ্গলের গতি পথে যে অসংগতি ধরা পড়ে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কেপলের এই গতি পথের অসংগতি নিয়ে ভাবেন।

এই প্রাহায় এলবার্ট আইনস্টাইন এসেছিলেন,সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ পঠনের জন্য, পরিবেশ পরিচিতি ভুলে অনন্যমনা হয়ে গণিত চর্চায় মাতেন। তাঁকে দেখে একটি উপন্যাস লেখা হয়ঃ *Redemption of Tycho Brahe*—টাইকো ব্রাহের দায়মুক্তি! সেখানে টাইকো দেখেন তাঁর শিষ্যের, কেপলেরের ধীরে ধীরে অন্তর্লীন হয়ে কাজে মগ্ন হওয়া।—এই অনন্যমনস্কতা কেপলেরের ক্ষেত্রে এবার দেখা দিল—তবে সেদিন টাইকো বেঁচে নেই। উপন্যাসকার কিছুটা পোয়েটিক লাইসেন্স নিয়েছিলেন। দীর্ঘ পঁচিশ বছর কেপলের মগ্ন রইলেন ব্রাহের গুছিয়ে রাখা তথ্য নিয়ে—১৬০২ থেকে ১৬২৭ সাল অবধি। তারপর টাইকো ব্রাহের দায়মুক্তি ঘটে।

গ্রীকরা আকাশ দেখেনি। আকাশ দেখেছিল মিশরীয়রা, মেসোপটেমিয়ানরা। তাদের দেখার আলো দিয়ে গ্রীকরা তথ্য নিয়ে তত্ত্ব সাজাতে বসেন। আরিস্তোত্‌ল্ পর্যন্ত গ্রীসে সেই তথ্য নিয়ে নানা আলোচনা চলে। আকাশে অনেক বস্তু, তারা সবাই ঘোরে; ঘোরে মানুষের চোখের দেখায় অথবা পৃথিবীর সাপেক্ষে। সূর্য ঘোরে দ্বাদশ রাশিচক্রের পথে—সে পথে গ্রহরা যায়। যে তারা গ্রীষ্মে দেখা যায়, শীতে সে সব হারিয়ে যায়, নতুন তারা আসে। এই নক্ষত্র-গ্রহদের পথ যেন এলেমেলো, গতি কখনো বেশী কখনো কম। এদের নিয়ে ভেবে আরিস্তোত্‌ল্ ভাবলেন বিশ্বলোক পঞ্চান্নটি বৃত্তে ভাগ করা। বৃত্তের কেন্দ্রে থাকে পৃথিবী। নক্ষত্ররা এই পথে এক বৃত্ত থেকে অন্য বৃত্তে যাতায়াত করে—যাতায়াত করে ইথার বা ব্যোমের মাধ্যমে। ইথারের মাধ্যম সব

অঞ্চলে একবাধা তোলে না বলে, নক্ষত্রের গতিতে ইতস্তত দেখা দেয়, গতির পরিবর্তন ঘটে আর তেমনি নানা বৃত্তে যাতায়াতের জন্য ঘটে দিকের পরিবর্তন। এই তত্ত্ব গ্রহলোকেও প্রযোজ্য। এই গ্রহ নক্ষত্রের পথ যেন শিকলের জোড়া অংশ বা বাংলা সংখ্যা চার—৪।

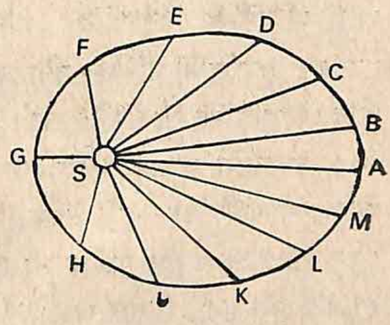
আরিস্তোত্‌ল্ থেকে টলেমি হলেন আরো প্রায় চারশ বছর পর। ইতি-মধ্যে নানা জায়গার আকাশ দেখার ইতিবৃত্ত আলেকজান্দ্রিয়ায় এসেছে। টলেমি জেনেছেন, গ্রহনক্ষত্র যতটা আগে জানা ছিল, তার চেয়ে আছে বেশি। তবে এই সংখ্যাও সীমিত। আরিস্তোত্‌লের পঞ্চান্ন বৃত্তপথ বেড়ে টলেমির হাতে আশিতে দাঁড়ায়। আরিস্তোত্‌লের ব্যোম বা ইথার টলেমির কাছে থাকে। সে হলো আকাশ বস্তুর উপাদান। তাদের পথের দিশারী, মাধ্যম। তবে গ্রহদের পথ ঠিক ৪ নয়। টলেমি ভাবলেন এপিসাইকেলের পথ। একটি বৃত্ত যদি আরো একটি ঘূর্ণ্যমান বৃত্তের পরিধিতে তার কেন্দ্রকে রেখে ঘোরে তবে যে পথ পাওয়া যায় তাহলো এপিসাইকেল : যেন খোলা চার বা ৪। এইপথে গ্রহরা যে ঘোরে তা এতদিন মানা হয়েছে।

অথচ টাইকোর জানা পথে অন্য ছকের ইশারা। মঙ্গল গ্রহের যে পথ নানা দেখার সূত্র ধরে টাইকো এঁকেছেন, সে পথ ৻ আকার। খোলা চার যেন আরো খুলে দাঁড়ায়। বহু বছর ধরে টাইকো প্রতিদিন দেখে এই পথটি স্থির করেছেন। এই ছক মানে না আরিস্তোত্‌ল্‌কে, মানে না টলেমিকে। টাইকোর দেখা—বিজ্ঞানীর দেখা। সেখানে ত্রুটি থাকে না এই বিশ্বাস কেপলেরের। এ যে কী দায়!

মার্কারি-পৃথিবীর গতিপথের নানা সম্ভাবনা নিয়ে সত্তরটি উপপত্তির কথা ভাবেন কেপলের। তার একটির উত্তরে দেখেন ব্রাহের ফলাফল থেকে তফাত মাত্র এক ডিগ্রির বারোভাগের একভাগ অথবা ৮ মিনিট। পরে, আজকের গণিতজ্ঞরা অনেক শুদ্ধ অঙ্কের পদ্ধতি ধরে কষে দেখেছেন, কেপলেরের বলা ফলে তফাত ছিল মাত্র একের দশ ডিগ্রি—ছয় মিনিট। অন্য কেউ হলে এই উত্তরকে শুদ্ধ ভাবতেন। কিন্তু কেপলের অন্য ধাতুতে গড়া। তিনি লিখলেন, 'টাইকো ব্রাহে নামক অনন্যপূর্ব এক দর্শককে

ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন—আমরা ঈশ্বরের এই অপূর্ব দানটিকে শুধু যে গ্রহণ করব তা নয়, এর সুব্যবহারও করব। একে তুচ্ছ করা যায় না—এই যে আটমিনিটের তফাত—হয়তো তার মুক্তিতে ঘটবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের নবশরীর।' (কেপলেরের স্বপ্ন)

বৃত্তাকার নানা আকারের সংযোগ নিয়ে কেপলের ভাবেন—উত্তর মেলেনা। তারপর টাইকোর জানানো ওভাল পথ নিয়েও ভাবেন—এবারও উত্তর পাওয়া যায়না। তবে কি কোপার্নিকাস ভুল? না, কেপলের নিঃসন্দেহ এই গ্রহ লোক সৌর কেন্দ্রিক। অবশেষে কেপলের বেছে নেন গ্রহদের উপবৃত্তাকার পথ—ইলিপ্স। না, এখানেও গোলমাল। ইলিপ্সের কেন্দ্রে সূর্যকে রাখলে হিসেবে গরমিল ঘটে। সবশেষে সূর্যকে রাখা হলো ইলিপ্সের একটি ফোকাসে। উত্তর পাওয়া গেল—টাইকোর জানানো পথে আর অঙ্কে গড়া পথে গোল নেই। এরা এক। গ্রহপথ উপবৃত্তাকার। এক এক করে অন্য গ্রহদের পথ নিয়ে টাইকোর জানানো ছক নিয়ে কেপলের মেতে যান—সব গ্রহদের পথ উপবৃত্তাকার। বৃত্তাকার পথের অবলুপ্তি ঘটে। কেপলের নিশ্চিন্তে বলেন, 'সব সংশয়ের অবসান ঘটে, টাইকো। তোমার জানানো পথ জানায় কোপানিকাসই সত্য, আর আরো সত্য হলো গ্রহদের পথ উপবৃত্তাকার।—বুঝলে ওথেলোর অকুপেশনের সমাপ্তি ঘটে গেল। কি হবে আর কি হবেনা—এই ভাবনার নিবৃত্তি ঘটলো।—আরো কিছুদিন যদি বাঁচতে, টাইকো! পরিশোধের দায়মুক্তি ভবিষ্যৎজনরা জানলো—কেউ জানলো না যে ভার তুমি কাঁধে চাপিয়ে ছিলে, কত বছরের চেষ্টায় তার সমাধান পেয়েছি। টাইকো ফিনিক্স তুমি ছিলে বলে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের নব অরুণোদয় হলো।'



কেপলেরের আঁকা ছবি
গ্রহের ইলিপ্সের পথ।

তবু একটি সমস্যা—গ্রহেরা পথে ঘোরে কি করে? গিলবার্টের চুম্বক তত্ত্বের মতো এখানে নিশ্চয় কাজ করে দূরপ্রসারী কোনো ফোর্স—সে কি চুম্বক শক্তি? যতদিন যায়, তত কেপলের ভাবেন এই শক্তির জোগানদার সূর্য—যে আছে গ্রহলোকের কেন্দ্রে!

ইলিপ্সের পথে কেপলের দেখেন গ্রহের পথ এমন যে সূর্য সংযোগী রেখা দিয়ে বিভিন্ন সময়ে পথে যে অংশ পাওয়া যায়, তাদের ক্ষেত্রফল এক। এই দুই আইন নিয়ে ১৬০৯ সালে তিনি প্রথম বইটি প্রকাশ করেন। নিউ এস্ট্রোনমি—নব জ্যোতির্বিজ্ঞান। পরের বছর টেলিস্কোপের আবিষ্কার ঘোষণা করলেন গালিলিও। আর এই সংবাদে উত্তেজিত হয়ে কেপলের নিজেও টেলিস্কোপ বানাতে উদ্যোগী হলেন। এস্ট্রোনমিকেল টেলিস্কোপের আবির্ভাব তাঁর হাতে—যেখানে ছায়া ধরা দেয় উলটোমুখী অথচ বিবর্ধন বা মেগনিফিকেসনের ক্ষমতা অনেক বেশি। এছাড়া তিনি লেন্স তত্ত্ব জানালেন,—যা নিউটন প্রায় অপরিবর্তিত আকারে অপটিকস্ বইটিতে স্থান দিলেন।

আর অন্যদিকে বিশ্বলোকের গণিত ভাবনা নিয়ে কেপলের কাজ করেন। চেনাজানা গণিতের সঙ্গে আছে লগারিথম, প্রাথমিক এলজেব্রা আর কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রির ভ্রূণ। এসব তিনি শিখলেন। এবং ১৫ই মে ১৬১৮ সালে, অনেক পরীক্ষা গবেষণার পর, অনেক অঙ্ক কষার শেষে জানালেন একটি তত্ত্ব—দুটি গ্রহের নিজস্ব কক্ষের পরিভ্রমণের সময়ের বর্গ আর সূর্য থেকে তাদের দূরত্বের ঘনফল সমান। সৌর লোকে সুরসঙ্গতি-হার্মোনি আছে। বিশ্বের অর্কেস্ট্রায় বেসুর বেতাল নেই—আছে সুষমা, আছে ছন্দ। কেপলের আজ বিজয়ী।

উল্লাসে কেপলের বললেন, 'প্রবল পবিত্রপূত উত্তেজনার কাছে আমি নিজেকে বিলিয়ে দিলাম। তুচ্ছ মরণশীল প্রাণজগতের কাছে মুক্ত কণ্ঠে আমার স্বীকৃতি জানাই—ইজিপ্টের স্বর্ণপাত্র চুরি ক'রে তাতে রেখেছি আমার ঈশ্বরের জন্য পবিত্র আচ্ছাদন—সে রইল ইজিপ্টের সীমার বাইরে। যদি আমাকে ভুলে যাও, খুশি হব। যদি ক্রুদ্ধ হও, সহ্য করব। পাশার এই দান আমি ফেললাম, এই বই লিখলাম আজকের

আর ভবিষ্যতের জন্য। সব কিছু আমার কাছে সমান আজ। একজন দর্শকের জন্য ঈশ্বর ছয়হাজার বছর অপেক্ষা করেছিলেন। আর আমার বইয়ের পাঠকের জন্য হয়তো অপেক্ষা করতে হবে কয়েক শত বর্ষের।'

……জ্ঞানের আনন্দ, জানার আনন্দের কাছে সবতুচ্ছ। তবু শোন অমৃতের পুত্রেরা, অন্ধকারের ওপারে যে জ্যোতির্ময় সত্য আছে, তাকে আমি জেনেছি। জানানো আমার কর্তব্য, আমার আনন্দ, আমার ভালবাসা, সুখ-দুঃখ, আমার জীবন। যদি পার গ্রহণ করো। যদি অবহেলা কর তবে সে তোমাদের সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা। সত্য প্রতিষ্ঠা পাবে—আজ না হলে কাল অথবা পরশু।……

এর পরও কাজ করে গেলেন—সেই দুর্বল শরীর ক্ষীণদৃষ্টি মানুষটি। চাঁদের টানে জোয়ার ভাঁটার কথা জানালেন। জানালেন সূর্যের করোনা বা ছটার কথা—যার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় গ্রহণের কালে। এই ছটা আর সৌর কলঙ্ক এরা সৌর আবহমণ্ডলের অংশ। জানালেন সূর্য থেকে যত দূরে যায়, ধূমকেতুর ল্যাজ ছোট হতে থাকে—তার কারণ সূর্যের আকর্ষণ-বিকর্ষণ শক্তি,যার দেখা গিলবার্ট দেখেছেন চুম্বকে। আর ভল্যুম মাপার অঙ্কের পথে কেলকুলাসের দেউড়ির সামনে দাঁড়ালেন।

এক আশ্চর্য বোধি মননের সমন্বয় ঘটেছে কেপলেরের মাঝে। মনের গভীরে যে কল্পনা-ধারণা হঠাৎ দেখা দেয়, তাকে চিন্তার জারক রসে সিঞ্চিত করে বাইরে এনে নেড়ে চেড়ে দেখেছেন। যা ছিল কল্পনা, হঠাৎ তা মোনালিসার মুখের রহস্যময় হাসি হয়ে বাস্তবে প্রকাশ পায়। সেই অনাবিল সুন্দর সুষমা—সেই তো কেপলেরের সত্য!

আর তার সমকালীন গালিলিও—তিনিও ভেবেছেন। সেই ভাবনার ভিতে কল্পনা নেই, আছে বাস্তব চেতনা। গালিলিও যেখানে যুক্তিনিষ্ঠ স্পষ্ট, স্বচ্ছ—কেপলের সেখানে রেশনালিস্ট—যুক্তিবাদী। কেপলের অনেক আধুনিক। তার কারণ তাঁর গণিত নির্ভরতা। গণিতকে ভাষা হিসেবে ব্যবহারে তাঁর অকৃত্রিম আগ্রহ।

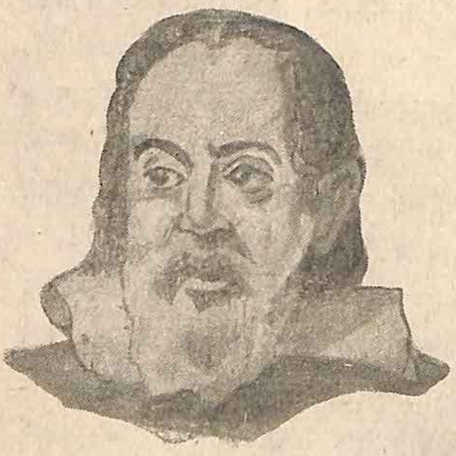
তবু কত দিন ধরে, কত সময় নিয়ে কেপলের তাঁর কথা জানালেন!

Thou Comest to use thy tongue ? Thy story quickly…

না,কেপলের দ্রুতগল্প বলতে পারেন না,জানেন না। তাঁর গল্প শুরু অনেক পরে ; সে গল্প সংক্ষিপ্ত ; অথচ তা ভুলে না যাবার। ফেলে না রাখার।

ঝড়ের রাতের অভিসার

কোপার্নিকাস-স্তেভিন-টাইকো ব্রাহে এবং কেপলের নব জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূচনা করলেন। পরিপূরক ভাবে পাওয়া গেল কাইনেমেটিক্স বা গতিবিজ্ঞানের রূপরেখা। রেনাসাঁসের আবির্ভাবে নতুন বিজ্ঞান নব শরীর নিয়ে ফিনিক্সের মত চিতা থেকে উঠে দাঁড়ায় ; তার চোখ আকাশে ; ডানার ঝাপটানোতে উড়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা। তবু কত বাধা। বাধা পুরনোকে ছেড়ে দেবার, বাধা চারদিক দেখার কুয়াশা, বাধা নতুন ডানার অশক্তি, পায়ে পাতা জালের ফাঁদ। এই দুস্তর বাধা ভেঙে ফেলে এগিয়ে যাবার জেদ আর গোঁয়ারতুমি—সেও পাওয়া গেল রেনাসাঁসের কাছ থেকে। কিছু পেতে গেলে কিছু দিতে হয়—নব বিজ্ঞানকেও দিতে হলো। দিতে হলো এ যুগের প্রাণপুরুষ গালিলিও গালিলিকে !



গালিলিও

জন্ম ও মৃত্যু-দুটি সনে গালিলিও দুজন মহাপুরুষের সঙ্গ পেলেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৫৬৪ সালে পিসাতে তাঁর জন্ম—যে বছরে, ধরা হয়, শেক্সপিয়ার জন্মেছিলেন এবং টাইকো ব্রাহে প্রকাশ করেন বৃহস্পতি-শনি গ্রহের সম্মেলনের অনুপুঙ্খ বর্ণনা। গালিলিও মারা যান আটাত্তর বছর বয়সে ১৬৪২ সনে—যে বছরে বড় দিনের শ্রেষ্ঠতম উপহার হিসেবে পাওয়া যায় সার আইজাক নিউটনকে। শেক্সপিয়ার আর নিউটন দুজনকে জন্ম মৃত্যুর ভেলায় চাপিয়ে দুস্তর পারাপার পাড়ি দিতে নামেন গালিলিও। বাবা ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ, কেপলের

তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তবে সুনাম আর দুর্নাম ছিল স্পষ্ট বক্তা বলে;সবকিছু যুক্তি দিয়ে বিচার করে মানতেন বলে সঙ্গীত নামক অনুভূতি প্রবণ শিল্পের চর্চা করলেও,ব্যবহারিকজীবনে যুক্তি আর তর্ককে উঁচু জায়গা দিলেন। বাবার কাছ থেকে গালিলিও যুক্তিমন্যতা পেলেন আর পেলেন স্পষ্ট কথা স্পষ্ট ভাষায় বলার প্রবণতা। সত্য বলো, প্রিয় বাক্য বলো, কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলো না—এই উপদেশটি গালিলিও শুনে থাকলেও মেনেছিলেন, এই দুর্নাম কেউ তাঁকে দিবে না।

ছোটবেলা থেকেই অদ্ভুত স্মরণ শক্তির অধিকারী তিনি। বিরাট বিশাল কবিতা অক্লেশে মুখস্ত বলতেন। দান্তের ইনফার্নো যে মুখস্ত ছিল তা নয়, প্রথম ছাত্রজীবনে যে বক্তৃতা দিয়ে শিক্ষকদের চমৎকৃত করেন তাহলো ইনফার্নোর একটি সমালোচনা। তখন তাঁর বয়স বড় জোর চৌদ্দ পনের। তবু বাবা ঠিক বুঝলেন, ছেলের মানসিকতা হলো বিজ্ঞান চর্চায়। ব্যবসা বা সাহিত্য —এসবে গালিলিও বিশেষ কিছু হবে না। তাই সতের বছর বয়সে পিসাতে চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়াতে পাঠালেন। এখানে শিক্ষক সেসালপিনোর (*Cesalpino*) কাছে আরিস্তোত্ল্ পড়লেন। বড় যত্ন করে সেই পড়া। আরিস্তোত্ল্ তাঁকে মুগ্ধ করে, তবু তাঁকে নিয়ে তিনি প্রশ্ন করেন। এই প্রশ্ন করার প্রবৃত্ত দেখে তাঁর চলতি নাম কুটকচালে, তার্কিক অথবা *Wrangler* বলে।

পিসাতে আসার প্রথম বছরেই গির্জায় ঝোলানো আলোর দোলন দেখে তিনি পেণ্ডুলাম তত্ত্বের দ্বারে আসেন। গির্জায় যাজক কি বলল না বলল তা তাঁর কানে ঢোকেনা, দু চোখের বিস্ময়ে আলোর দোলন দেখেন, নাড়ি ধরে সময় মাপেন, আর বাড়ি ফিরে একটা তারে বুলেট বেঁধে তার দৈর্ঘ্য কম বেশি করে পেণ্ডুলামের নিয়ম আবিষ্কার করেন। তখন বয়স বড় জোর আঠারো। অবশ্য অন্য আরেকটা মত হলো একুশ বছরে তিনি পেণ্ডুলামের নিয়ম খুঁজে পান। এই পিসাতে ছাত্রজীবনের দ্বিতীয় বছরে বিখ্যাত জ্যামিতিকার রিক্কির (*Ricci*) লেকচার শুনে গণিতে ইণ্টারেস্টেড হলেন। মনে হলো গণিতের ধারায় অশেষ

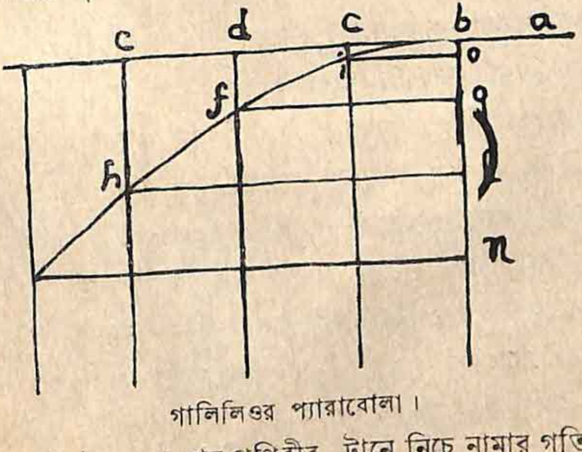
সম্ভাবনা ধরা যাবে। আর সেই সময়ে পড়তে থাকলেন আর্কিমীদিস। এই পঠনে জানলেন বিজ্ঞান কাকে বলা হবে, কেমন করে বিজ্ঞানের চিন্তাকে সংক্ষিপ্ত-সংবদ্ধ আকারে সর্বজনীন রূপে গণিতের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। আর্কিমীদিসের প্রণালীটি তিনি সেই যে আঁকড়ে ধরলেন, তা আর ত্যাগ করলেন না। তাছাড়া আর্কিমীদিসের মত একাই তিনি হলেন পরীক্ষক আর তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী ; তিনি যেন ব্রাহে আর কেপলেরের সমন্বয়। আর্কিমীদিস চর্চায় মাতলেন বলে, পেণ্ডুলাম ছাড়া স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি নিয়ে অনেক কাজ করলেন। বিদগ্ধ মহলে গালি-লিওকে নিয়ে সাড়া জাগে। নিজেকে বেশ কেউ কেটা মনে হয় তাঁর। ছাত্র জীবনে স্নাতক হবার আগে এমন প্রতিষ্ঠা কত জনের হয়? তবু আর্কিমীদিস নিয়ে, আরিস্তোত্‌ল্ নিয়ে পুরনো চিন্তার রেশ নিয়ে মাতলেও, রেনাসাঁসের চিন্তার মুক্তির ঝোড়ো হাওয়া তাঁকে পক্ষপাত শূন্য করে তোলে। আর রেনাসাঁসের নিজস্ব কারিগরি শিক্ষা—যন্ত্র তৈরির দক্ষতা—সেটিও তিনি আয়ত্বে আনলেন।

ডিগ্রি না নিয়ে পিসা ছাড়লেন। শিক্ষকতা করে দিন গুজরান চলেছে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিতে দরখাস্ত পাঠান। পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় আবেদন নাকচ করে। অবশেষে সেই পিসাতে ১৫৮৯ সালে গণিতের অধ্যাপকত্বের শূন্য পদে তিনি যোগ দেন। চাকরির নিয়োগের শর্ত হিসেবে তাঁকে আরিস্তোত্‌লের বিজ্ঞানটিকে শিক্ষা দিতে হবে। অত-এব, গালিলিও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আরিস্তোত্‌লের মেকানিক্স—গতি-বিজ্ঞান পড়লেন এবং পড়লেন এই বিষয়ে সে যুগে যত আলোচনা হয়েছে —যা তার হাতে পেলেন সবকিছু। পড়াতে ফাঁকি নেই—কারণ শিক্ষকতা মানে নিজেকে শিক্ষিত করতে হবে—এটি তাঁর বাবার একটি আপ্ত বাক্য।

এদিকে কামান আর অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্রের আবিষ্কারের ফলে দ্রুতগতি নিয়ে চিন্তার আরম্ভ হয়েছে। এই চিন্তার সামিল গালিলিও হলেন। নিচে বস্তু কোন্ গতিতে নামে, তার চিন্তাতে তিনি ভাবলেন স্লোপে বস্তু কেমন ভাবে নামে। তিনি দেখলেন বস্তু যত নিচে নামে, তার গতি তত বাড়ে,

বাড়ার হার সময়ের বর্গের সঙ্গে মিল টানে। এবং তিনি দেখলেন এই নামার মাপের একটা সর্বজনীন রূপ আছে—একে জানানো যায় $16t^2$ নামের ফর্মুলায় যেখানে t জানায় সময় বা সেকেণ্ড। গালিলিও কেলকুলাস জানতেন না বলে ভেলসিটি একসিলারেসেন্সের দুয়ারে কড়া নাড়িয়েও বলতে পারলেন না মাধ্যাকর্ষণের টান হলো 32 ফিট/সেকেণ্ডে। তবু ত্বরণ আর গতির প্রমাণ দিলেন আর জানালেন আরিস্তোত্‌লের ধারণা ভুল। তিনি আরো দেখলেন, বাধা না পেলে কোন গতিমান বস্তুর গতির হার কমবে না। এই চিন্তার সূত্রে তিনি ইনারশিয়া বা জাড্যের ধারণা আনলেন। আর পিসার টাওয়ার থেকে ছোটবড় নানা ওজনের বস্তু একসঙ্গে ফেলে দেখালেন, সব বস্তুর নিচে নামার গতি এক। বাতাসে কিছু হেরফের ঘটলেও, বায়ুশূন্য স্থানে এই গতিতে পার্থক্য নেই। আরিস্তোত্‌ল্ এখানেও ভুল। এসব তথ্যতত্ত্ব গালিলিও ইতালীয় ভাষায় প্রকাশ করলেন। ডাচ ভাষায় প্রকাশিত স্তেভিনের জানানো এই তত্ত্ব অজ্ঞাত ছিল, কারণ কটা লোক আর ডাচ জানে?

এরপরে গালিলিও বললেন ছুটে যাওয়া ছুঁড়ে ফেলা যে কোনো বস্তুর গতিতে আছে দুটো ভাগ—একটা হলো তার চলার গতি যা সে



গালিলিওর প্যারাবোলা।

পেয়েছে, দ্বিতীয়টা হলো তার পৃথিবীর টানে নিচে নামার গতি। দুটো গতিকে একটি গ্রাফে এঁকে গালিলিও পেলেন প্যারাবোলা। এই ছুটে যাওয়া পদার্থের অনুভূমিক গতি এক থাকলেও, তার নিচে নামার গতি-

বেগে কাজ করে সময়ের বর্গ। দুই গতির গাঁটছড়া বাঁধা যে গতিপথ পাওয়া যাবে, সেটি প্যারাবোলা।

১৫৯২ সালে পাদুআ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যোগ দিলেন। মাইনে খুব একটা বেশি হলো না—তবে সম্মান আর বাড়ি এবং প্রতিপত্তিতে সব কিছু পুষিয়ে যায়। এইখানে ঘনমূল-বর্গফল-বর্গমূল মাপার একটা রূপ তিনি বানান—যা পরবর্তী কালে স্লাইডরূলে পরিবর্তিত আকারে স্থান পেল। তাঁর পড়ানোর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। রাজারাজরার ছেলেরা তার কাছে পড়তে আসে। আসে জার্মানির যুবরাজ ফার্দিনান্দ, টাসকানির গ্র্যাণ্ড ডিউকের ছেলে কসিমে মেডিচি! সুখ সম্পদ সম্মান সব নিয়ে গালিলিও সুখী হন, আবার শত্রুও তৈরি করেন।

পাদুআতে ১৬০৪ সালে মহাকাশে আরেকটি সুপার নোভার আবির্ভাব ঘটে। ১৫৭২ সালে টাইকোর মনোজগতে এজাতীয় আবির্ভাবে যে আলোড়ন ওঠে, গালিলিও সেই এক উত্তেজনার স্পর্শ পান। তিনি হঠাৎ খবর পান কোপার্নিকাসের তত্ত্ব সঠিক। আর এই বক্তব্য প্রচারে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ভেনিস, সেদিন ব্যবসাবাণিজ্যে সমৃদ্ধ বলে, রোমের তাঁবেদার হবার প্রয়োজন ঘটেনি। গালিলিওর বক্তব্য রোম পছন্দ করুক বা না করুক—তা নিয়ে ভেনিসের মাথা ব্যথা নেই। আর গালিলিও তাই খুশিমনে কোপার্নিকাসের তত্ত্বের আলোচনায় মেতে ওঠেন।

১৬০৯ সালে গালিলিও ডাচদের টেলিস্কোপ আবিষ্কারের খবর শুনলেন। আর অমনি নিজের জন্য একটা বানালেন। ভেনিসের শাসকরা দেখেন জাহাজ আসার পথে নজরদারি-খবরদারি করতে এই যন্ত্র বেশ কাজের, তাই তারা গালিলিওর মাইনে আর সম্মান দুটোই বাড়িয়ে দিলেন। নিজের জন্য একটা উচ্চশক্তির টেলিস্কোপ তৈরি করলেন গালিলিও, যার বিবর্ধন ক্ষমতা ত্রিশগুণ। সেটি নিয়ে সন্ধ্যেবেলায় ছাদে বসে আকাশ দেখেন। প্রথমে ছিল ছেলে খেলা—সময় কাটানো। আর ধীরে ধীরে আকাশ দেখা তাঁর নেশা হয়ে দাঁড়ায়। রাতের পর রাত, শীত বা গ্রীষ্মে আকাশ দেখে চিরকালের জন্য হাঁপানি আর কাশ রোগটি জুটিয়ে নিলেন, আর মহাকাশের দূরের দরজাটি খুলে ধরেন। তিনি জানালেন

ছায়াপথ তারায় ভরা ; চাঁদে আছে খানা-খন্দ, পাহাড়-সমুদ্র ;—সেই পাহাড়ের উচ্চতা তিনি ছায়ার দৈর্ঘ্য মেপে জানালেন ; জুপিটার ধরা দিল গোলক আকারে, স্ফিয়ারে,আর পেলেন তার চারপাশে ঘোরে চার-চাঁদ—যেন চাঁদের হাট। এসব আবিষ্কার নিয়ে গালিলিও একটি বই প্রকাশ করলেন—*Sidereal Messanger* বা তারকার দূত ! সহজ সরল ইতালী ভাষায় লেখা। এই লেখা প্রকাশে যে উত্তেজনার ঢেউ জাগে তার তুলনা করা যায় যেন এটম বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে। তাঁর গড়া টেলিস্কোপ নিয়ে ঘরে ঘরে ক্ষুদে জ্যোতির্বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটে —তারকাদের শান্তি যেন আর থাকে না !

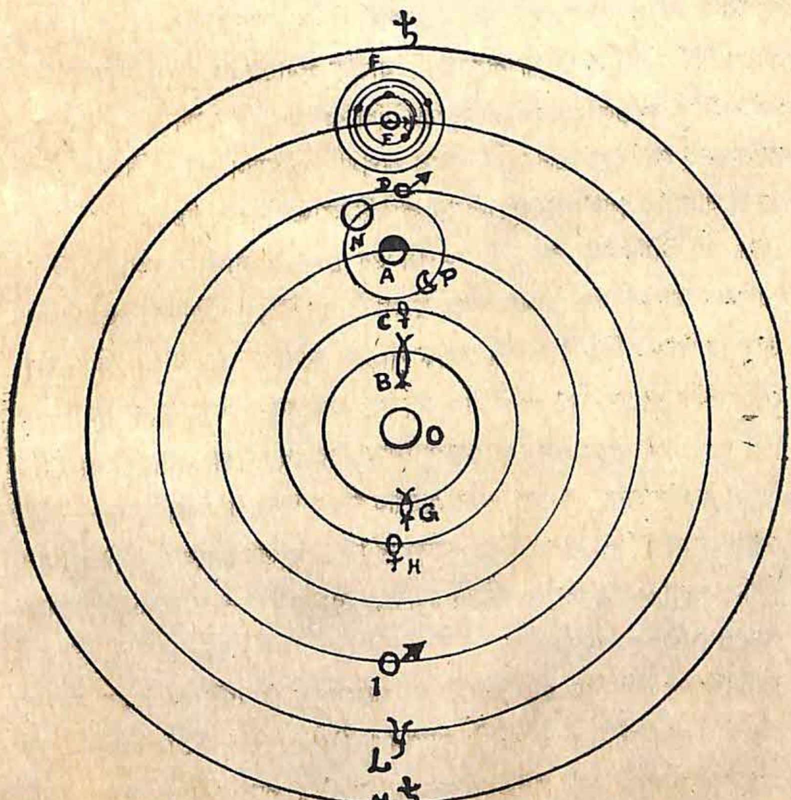
অন্যদিকে জুপিটার আর তার চাঁদ যেন কোপার্নিকাসের তত্ত্বের একটি প্রমাণ। জুপিটার আর চাঁদের পরিব্যাপ্তিতে সূর্যকেন্দ্রিক গ্রহলোক প্রতিষ্ঠা পায়—অন্তত যুক্তি তাই বলে। গালিলিও আরো সোচ্চার হয়ে ওঠেন।

এই সময়ে টাসকানির ডিউক হলেন গালিলিওর শিষ্য। তাকে গালিলিও ধরে বসেন। বলেন, অধ্যাপনা ভাল লাগে না, গবেষণায় মন দিতে চান, চান বই লিখতে—একটা ভালমত ভাল মাইনের চাকরি পাওয়া যাবে ? শিষ্য গুরুকৃত্য করতে আগ্রহী হয়ে এমন একটা পদের সৃষ্টি করে পিসাতে যোগ দিতে ডাকেন। এদিকে ভেনিসের শুভানুধ্যায়ীরা তাঁকে পিসা যেতে বারণ করে। পিসার গ্র্যাণ্ড ডিউক যত শক্তিশালীই হোক না কেন রোমের নির্দেশনার বিরুদ্ধে কিছু করার মত ক্ষমতা তার নেই। রোমের উপর টাসকানি নির্ভরশীল।—শুভানুধ্যায়ীদের কথায় গালিলিও কান দেন না। ভেনিস ছেড়ে ফ্লোরেন্সে যান। আর কয়েকদিনের মধ্যে কোপার্নিকাসের তত্ত্বের আরেকটি প্রমাণ হাজির করেন—সৌর-কলঙ্ক ; আর এই আবিষ্কারের পথে জানলেন সূর্যও নিজের অক্ষে ঘোরে। চাঁদের আরো অজানা রহস্যের ঠিকানা খুঁজে পেলেন আর একই সঙ্গে হাইড্রোস্ট্যাটিক্সে দুর্দান্ত এক কাজ করে বসেন। সমা-লোচকরা একের পর এক নতুন নতুন ঘটনার আবির্ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে ক্ষেপে ওঠেন। সবার আগে চটে জেসুইটরা। তাদের একজন স্কাই-

নার (*Scheiner*) সৌরকলঙ্ক দেখেছিলেন—তবে সেকথা আরিস্তোত্‌লে নেই বলে জানান নি—অথবা তাকে জানাতে দেওয়া হয়নি। আর প্রথম আবিষ্কারের কৃতিত্বটা গালিলিও কেমন আত্মসাৎ করল! অন্যদিকে তাঁর কোপার্নিকাসীয় মতবাদ ধর্মের ধারকদের পছন্দসই নয়। এটি বাইবেলের জেনেসিসের পরিপন্থী, এতদিন ধরে আঁকড়ে থাকা গ্রীক ধারণার বিপরীত! অথচ গালিলিওকে থামানো যায় না। ১৬১৬ সালে তিনি নিজের বক্তব্য শোনাতে রোমে গেলেন। পোপ কার্ডিনালরা তাঁকে সসম্মানে গ্রহণ করলেন; একথা সেকথা হলো। তবে তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে না-রাম না-গঙ্গা কোন উচ্চবাচ্যই হোল না। তাঁর বিদগ্ধতাকে রোম সমাজ মানছে—তবে সেই বিদগ্ধতা তাঁকে রাজনীতিকদের কাছে প্রতিষ্ঠা দিচ্ছে না। অন্যদিকে গালিলিওর ব্যবহার গ্র্যাণ্ড-ডিউকের অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।…যে কথা, যে বক্তব্য এত যুক্তি সহ, এত যুক্তিগ্রাহ্য, তাকে মানতে অন্যের কেন এত অনীহা থাকবে? যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি খাড়া না করে কেন তারা তাঁকে থামতে বলে? কেন? গালিলিও তো চার্চের বিরোধী নন। তিনি চার্চের একজন সক্রিয় সভ্য। তবে চার্চ এক, আর বিজ্ঞান হলো অন্য কিছু—এমনটি কেন ভাবা হবে? চার্চের জ্ঞানে, বিজ্ঞান কি থাকবে না? ভুলকে আঁকড়ে থাকলে ঈশ্বর কেন খুশি হবেন? ঈশ্বর স্বয়ং যে নির্ভু্ল! যত কথাই তিনি বলুন না কেন রোমে ভবীদের চিঁড়ে ভেজেনা। বরং ইনকুইজিসন বা তদন্ত কমিশনের কাছে তাঁকে বলা হলো কোপার্নিকাস তত্ত্ব প্রচারে যেন তিনি বিরত হন।—গালিলিও রাজি হলেন।—ফ্লোরেন্সে ফিরে এলেন হতমান হয়ে।

জেসুইটদের ধূমকেতুর ধারণাকে নিন্দে করে হুম করে একটি পুস্তিকা এবারে লিখলেন। এখানেই জানালেন তাপের কারণ হলো গতি। আর জানালেন পঞ্চেন্দ্রিয়ে, শব্দ ঘ্রাণ বা স্বাদ নিয়ে যা ধরা যায়, যাদের বলা হবে সাবজেকটিভ বা বিষয়ী, তারা বস্তুর আকার আয়তন থেকে আলাদা—এরা জানায় অবজেকটিভ, কর্মকারকত্ব—বিষয়বিমুখীনতা। এই দুটি শব্দ এনে তিনি বিজ্ঞানকে আধুনিকতার তোড়নে হাজির কর-

লেন। এই পুস্তিকা—(*The Assayer*) বিশুদ্ধতার পরীক্ষা—জেসুইটদের চিরকালের মত তার শত্রুকরে তোলে। ১৬২৪ সালে আবার তিনি রোমে যান। অনেক উপহার পেলেন এবার, তবে তাঁর বক্তব্য শোনা হলো না। এই সময়ে তিনি তাঁর বিখ্যাত বই *Dialogue Concerning two world System* অথবা বিশ্বলোকের দুটি প্রণালী নিয়ে কথোপকথন রচনা লিখতে নিবিষ্ট হলেন। পাণ্ডুলিপি পাঠালেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক পোপের কাছে। পোপ কিছু পরিবর্তন-পরিমার্জন করেন



গালিলিওর সৌরজগত

এবং গালিলিওর জোয়ার ভাঁটা তত্ত্বকে নাকচ করে নিজের ধারণাটুকু লিখে প্রকাশের অনুমতি দিলেন।

সুবোধ বালকের মত গালিলিও বইটি প্রকাশ করলেন। আর প্রকাশের

পর জানা গেল যতটা ভাল মানুষ তিনি সেজেছিলেন তত ভাল মানুষ তিনি নন। ডায়লগে চারজন আলোচনার অংশী—একজন পুরনো মতে বিশ্বাসী, দ্বিতীয়জন কোপার্নিকাসের তত্ত্ব মানেন, তৃতীয়জন হলেন আলোচনার নিয়ন্ত্রক আর মধ্যপথাবলম্বী, মডারেটার। আর চতুর্থজন একটি গোবেচারা সাধারণ সরল সাদাসিধে লোক—এককথায় বোকা! পোপের সব বক্তব্য গালিলিও এই বোকার মুখে বসিয়েছেন! সমস্ত রোম যাজক সমাজ এই হঠকারী ব্যাপারে ক্রোধে ফেটে পড়ে। কী অপমান! কী অসম্মান! কতদূর স্পর্ধা ঐ লোকটার!

পোপ গালিলিওকে পছন্দ করতেন। যাজক সমাজের যুযুধান হাত থেকে অনেকবার আড়াল করেছিলেন; গালিলিওর বুদ্ধি তাঁর কাছে প্রশংসার। আর সেই পোপকে এত কুশ্রী ভাবে অপমান করলেন গালিলিও—একি ভাবা যায়! পোপ ইনকুইজিশন কমিটি অভিলাষী কার্ডিনালদের বললেন, 'যা ইচ্ছে হয় করো। আমি ওর কোনো ব্যাপারে আর নেই।' রোমের যাজকদের প্রথম কাজ হ'লো তাঁর বইয়ের বিক্রি বন্ধ করা। তারপর তাঁকে বিচার সভায় ডেকে পাঠান হলো। এইখানে বিচারের শেষে হাঁটু গেড়ে বসে গালিলিও ঘোষণা করলেন,—সজ্ঞানে, সুস্থমস্তিষ্কে তিনি ঘোষণা করেছেন যে কোপার্নিকাসের যে তত্ত্বের প্রচার এতদিন তিনি করছিলেন, তা ভুল—তা গ্রহণীয় নয়। ওটা গালগল্প মাত্র।—

শোনা যায় ইতিগজের উক্তির মতো তাঁর বিবৃতির শেষে অস্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেছিলেন, তবুও পৃথিবী ঘোরে, ঘুরবে। —তবে এ বক্তব্যের প্রমাণ নেই।

গালিলিওর শাস্তি হয় আজীবন গৃহবন্দীত্ব। এই বন্দীত্বের কালে তিনি তাঁর দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ বইটি লেখেন: *Two New Sciences*—দুটি নতুন বিজ্ঞান। এই বইটিতে জানালেন তাঁর আপেক্ষিকতাবাদ, গতিবাদ নিয়ে আলোচনা, স্পেস-টাইমের পরমত্ব নিয়ে সন্দেহ। বইটি হল্যাণ্ডে লুকিয়ে পাচার করেপ্রকাশ করা হলো ১৬৩৮ সালে। তারপরও তিনি কাজ করে যান। শরীর ভেঙে গেছে, চোখে ছানি, প্রায় দৃষ্টিশক্তি হারা। রাতের আকাশ দেখা বন্ধ। দিনের রোদে যেটুকু পারেন

লেখেন বা কাজ করেন। এরই মধ্যে কখনো কখনো জ্যোৎস্না রাতে গরমের দিনে মেঘমুক্ত আকাশে দূরবীন দিয়ে চাঁদ দেখেন।—চাঁদ শুধু চাঁদ, আর দূরে চোখ যায় না। তিনি দেখলেন চাঁদের উপরতলের পরিবর্তন, যাকে বলা হয় *Libration*। পরে নিউটন জানান যে এই পরিবর্তনের কারণ হলো চাঁদের গতির হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে বলে। ১৬৩৭ সালে জানালেন, পেণ্ডুলামের দৈর্ঘ্যের বর্গমূলের উপর নির্ভর করে পেণ্ডুলামের দোলন কাল। আর মৃত্যুর আগের বছর ১৬৪১ সালে সাতাত্তর বছর বয়সে ঘড়ির সঠিক সময় পেণ্ডুলাম দিয়ে কি ভাবে নির্দিষ্ট করা যায়, সে পরীক্ষায় মেতে উঠলেন—কাজটি শেষ করে যেতে পারেন নি! তরল পদার্থ নিয়ে কাজ করে জানলেন, শূন্যতার ধারণা। একটি সাকসান পাম্প তৈরি করে চব্বিশ ফুট উঁচুতে জল তুললেন। বললেন, প্রকৃতির ভয়ঙ্কর শূন্যতা ঐ চব্বিশ ফুটের সীমায় বাঁধা। তাঁর ছাত্র টরিচেল্লি এই গবেষণার বিস্তৃতি ঘটিয়ে ব্যারোমিটার তৈরি করলেন।

আশ্চর্য মানুষ গালিলিও। সে যুগের ছাত্রদের মধ্যে যে কটি দোষ দেখা যেত, ছাত্রাবস্থায় সব কটি দোষের ভাগীদার তিনি হলেন। নিজের জ্ঞানের প্রতি তাঁর যে ধারণা তাতে অন্যকে তুচ্ছ করলেন। তিনি ভাবতেন, ফিজিক্সে যেমন তিনি যোগ্য অধিকারী তেমনি জ্ঞানের অন্য শাখাতেও তাঁর বক্তব্য প্রকাশের অধিকার আছে। অথচ এই চিন্তা ভাবনাতে যুক্তি নেই। বিজ্ঞানের গবেষণায় তিনি যুক্তিনিষ্ঠ, উদাসীন ও নির্মম। সেই নির্মমতার প্রকাশ তাঁর আপনজনের সঙ্গে ব্যবহারে; সেখানে যুক্তি নেই। একটি যুগের অবক্ষয় আর অন্য একটি যুগের সূচনার ক্রান্তি কালের মানুষ বলেই তিনি এত বিরোধে ভরা, এত বৈপরীত্যে গড়া। এতবড় প্রতিভা—অথচ অন্যের প্রতি তাচ্ছিল্য, হঠকারিতা তাঁকে সুস্থিত থাকতে দেয় নি। গ্রীক জ্ঞানকে তিনি ছিন্নভিন্ন ক'রে পরীক্ষা করলেন, আর শেষে দেখেন তিনি গ্রীক ট্রাজেডির মহানায়কদের মত নিজের সৃষ্ট অপরাধের কাছে আজীবন নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে আছেন।—তবু অদম্য কর্মস্পৃহা তাঁকে থামাতে পারেনি। যন্ত্রণা তিনি ভুললেন বিজ্ঞানের গবেষণায়। তিনিই জানালেন, বিজ্ঞানের সত্যে থাকে যন্ত্রণার উপশমের ওষুধ—সে যন্ত্রণা যেমনই হোক। কারণ সত্যের উপলব্ধি আর প্রকাশে থাকে নারীর সন্তান প্রসবের আনন্দ—

বেদনার মুক্তি। এ তো শুধু সৃষ্টি নয়, এটি হলো প্রতিষ্ঠা—একটি চির প্রবহমান অন্বেষণের ধারার অনুসরণ।

······আর তার কাঁধে দাঁড়িয়ে নিউটন অনেক দূরে দৃষ্টি দিতে পারে। তিনি রেনাসাঁস যুগের ক্রিস্টোফার—যিনি শিশু যিশুকে কাঁধে করে নব যুগের দ্বারে পৌঁছে দিলেন।······

"নদীপার হলেন সেণ্ট ক্রিস্টোফার। স্রোতের বিরুদ্ধে সারারাত যুঝে গেলেন—খাড়া পাথরের মত তার বিরাট শরীর নিয়ে জলের উপর মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে। তার কাঁধে সেই শিশু, কত কোমল অথচ কত ভারি। ভারে কাঁধ-পিঠ বেঁকে গেছে। যারা তাকে দেখলো, তারা বাজি ধরে বলেছে, না সে পারবেনা। তাদের উপহাস ঠাট্টা তার পিছনে ভেসে এসেছে। তারপর রাত্রি নামে, ওরা ক্লান্ত হয়। পাড় থেকে, তাদের চিৎকার থেকে অনেক, দূরে ক্রিস্টোফার মাঝনদীতে হাজির হয়। স্রোতের গর্জনের মধ্যে শুধু সে শোনে শিশুটির শান্ত কণ্ঠস্বর—সেই দৈত্যের মাথার চুল ছোট মুঠিতে আঁকড়ে ধরে সে শুধু বলে—'এগিয়ে যাও।' কুঁজো পিঠে, সামনে চোখ রেখে দূরের অন্ধকার পাড়ের উঁচু ঢালু তীরভূমির সাদা অস্পষ্ট ছায়ার দিকে তাকিয়ে সে এগিয়ে যায়। সহসা ভোরাই গানের সুর জাগে, ঘুম ভাঙ্গানীয়া ঘণ্টা বেজে ওঠে। নতুন প্রভাত এসেছে। কালো পাথর ঘেরা তটভূমির চূড়ার আড়ালে অদৃশ্য সূর্যের নবারুণ আভা দেখা দেয়। বেদম, ক্লান্ত ক্রিস্টোফার শেষ পর্যন্ত নদীর পারে পৌঁছোয়। শিশুকে সে বলে, এসে গেছি। তবু তুমি কত ভারি। তুমি কে গো?

শিশুটি বলে, যে দিনের জন্ম হবে আমি সেই নতুন দিন।" (জাঁ ক্রিস্তফ)

······রেনাসাঁসের দুর্বহ বোঝার ভার কাঁধে নিয়ে নতুন দিনের দ্বারে বিজ্ঞানকে পৌঁছে দিল কোপার্নিকাস থেকে গালিলিও। কী অসহ্য সেই নতুন বিজ্ঞানের ভার, কি দুর্বিষহ সেই যাত্রাপথ!·········

তবু সংশয় থাকে। সেই সংশয় সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আর সাধ হলো—সবসত্যের শেষে তার কাছে,পরম সত্যের কাছে যাওয়া।—

—সে বড় ভার হে, ক্রিস্টোফার। বড় ভার! তবু মানুষ তো বাধা কাটাতে দৈত্য হতে পারে! পারে জায়েন্ট হতে!—